দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রাষ্ট্রহিতে সমর্পণই গুরুপূর্ণিমার সত্যার্থ
— পৃঃ ৩৩

জীবনে চলার পথে পথপ্রদর্শক হলেন গুরু
— পৃঃ ৩১

৭৮ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ২৭ জুলাই, ২০২৬।। ১০ শ্রাবণ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

শ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

कुटुंब प्रबोधन

जीवन यात्रा की नौका है परिवार,
जिसमे हम सात जन साथ हैं,
भवसागर पार करने हेतु

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ১০ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২৭ জুলাই - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

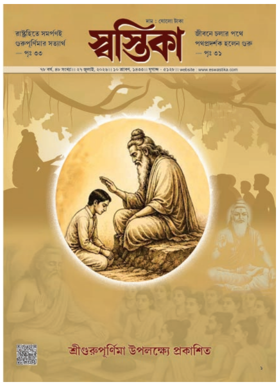

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক নয়, তাই ময়লা পরিষ্কারের পাশাপাশি ঘরও গোছাতে হবে : তেলাপোকা ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

এত উন্নয়ন চাই না ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

বন্দনীয়া মৌসিজী—এক চিরন্তন আদর্শ আজকের নারীসমাজের জন্য এক অনন্ত প্রেরণা ◻ ডঃ মৌমিতা বর ◻ ৮

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কেন 'পরমগুরু'? ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

বারুইপুরকাণ্ডে ঘোলা জলে মাছ ধরতে গিয়ে ভাবের ঘরে চুরি মমতা ব্যানার্জির, খসে পড়ল মুখোশ ◻ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ◻ ১১

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ নীরবে, নিভৃতে ◻ বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৩

পশ্চিমবঙ্গে এনকাউন্টার ঃ অপধারীধের কাছে শুভ সংকেত নয় ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৫

নবম ও দশম শ্রেণীর ইতিহাস সিলেবাস অনতিবিলম্বে পরিবর্তন করা প্রয়োজন ◻ ডঃ তরুণ মজুমদার ◻ ১৭

বালুচিস্তান ও ১৯৭১-এর প্রতিধ্বনি : দক্ষিণ এশিয়া কি আরেকটি ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে? ◻ অরিত্র ঘোষ দস্তিদার ◻ ১৮

জীবনে চলার পথে পথ-প্রদর্শক হলেন গুরু ◻ সূর্য শেখর হালদার ◻ ৩১

রাষ্ট্রহিতে সমর্পণই গুরুপূর্ণিমার সত্যার্থ ◻ দেবব্রত ভট্টাচার্য ◻ ৩৩

স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল শ্রীগুরুপূর্ণিমা ◻ ডঃ রাকেশ দাশ ◻ ৩৫

বাস্তুঘুঘু আমলাতন্ত্রের থেকে সাবধান থাকতে হবে নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ◻ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ◻ ৩৬

জগদ্‌গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৪৩

নির্বাসন থেকে ঘরে ফেরা : তসলিমা নাসরিনকে ঘিরে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি ◻ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ◻ ৪৫

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'পঞ্চ পরিবর্তন' ভাবনা পরম বৈভবশালী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত ◻ ডঃ সৌমিত্র চক্রবর্তী ◻ ৪৭

একুশে জুলাই আসলে কার? ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
৩ আগস্ট
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৩ আগস্ট
২০২৬

হুতাত্মা বীর চুড়কা মুর্মু

দেশের জন্য আত্মবলিদান জনজাতি সমাজের কাছে নতুন কথা নয়। ইতিহাসের পাতায় তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষায় বীর চুড়কা মুর্মুর বলিদান সারা দেশের মানুষ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় হুতাত্মা স্বয়ংসেবক বীর চুড়কা মুর্মু বিষয়ক কয়েকটি লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে স্বস্তিকার পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশি বর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতীয় সংস্কৃতির এক মহত্ত্বপূর্ণ তিথি শ্রীগুরুপূর্ণিমা

ভারতবর্ষ একদা বিশ্বগুরুর আসনে বিরাজমান ছিল। ইহলৌকিক সমৃদ্ধির শিখরে যেমন আরোহণ করিয়াছিল, পারলৌকিক বিষয়েও সর্বোচ্চ জ্ঞানলাভ করিয়াছিল ভারতবর্ষ। উভয় বিষয়ে এইপ্রকার সমৃদ্ধির নানাবিধ কারণের একটি হইল গুরুতত্ত্ব । গুরু হইতে শিষ্যের নিকট অবিচ্ছিন্ন ধারায় জ্ঞান ও ঐতিহ্য হস্তান্তরের এই গুরু পরম্পরা হইল একটি অতি প্রাচীন পদ্ধতি। আরণ্যক পরিবেশে গুরুগৃহে বাস করিয়া লব্ধ শিক্ষা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অথবা ধর্মীয় নহে, তাহার সহিত জীবনের সর্ববিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া এক পরিপূর্ণ মানব হইবার সাধনা। গুরু তাঁহার অর্জিত সমস্ত বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চার করিয়া তাহা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাই 'গুরু'কে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করা হইয়া থাকে। জীবনের পথপ্রদর্শক সেই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার একটি শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র পর্ব হইল গুরুপূর্ণিমা তিথি। যিনি আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি অজ্ঞানের অন্ধকার হইতে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া থাকেন তিনিই গুরু। গুরু শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল শিক্ষক অথবা দীক্ষাদাতা। সংস্কৃত 'গু' শব্দের অর্থ অজ্ঞানতা অথবা অন্ধকার এবং 'রু' শব্দের অর্থ 'বিনাশকারী' অথবা 'আলো'। অর্থাৎ যিনি শিষ্যের অভ্যন্তরের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়া সর্বপ্রকার শুভগুণের স্ফুরণ ঘটাইয়া থাকেন, তিনিই গুরু। গুরু ধারণার প্রাচীনতম উল্লেখ বৈদিক গ্রন্থসমূহে রহিয়াছে। স্মরণাতীতকাল পূর্বে ভারতবর্ষে গুরু পরম্পরার বিকাশ হইয়াছে। সমস্ত ভারতীয় ভাষায় গুরু শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। বৌদ্ধ পরম্পরায় গুরুপূর্ণিমা তিথি 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' দিবস হিসাবে পালিত হইয়া থাকে। জৈনমতে গুরুপূর্ণিমা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক তীর্থঙ্করদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দিন রূপে পালিত হইয়া থাকে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে গুরুপূর্ণিমা পর্বটি উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে মহাদেব শিবশঙ্করের নিকট এই তিথিতে সপ্তঋষি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু প্রমুখ দেবতা পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য পরমেশ্বর শিবের দক্ষিণামূর্তিকে 'গুরুমূর্তি' বলা হইয়া থাকে। আবার এই দিনেই মহর্ষি বেদব্যাসের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তিনি পূর্বের জ্ঞানভাণ্ডার সহজরূপে মানবজাতির নিকট উপস্থাপন করিয়া 'জগদ্‌গুরু' রূপে অভিহিত হইয়াছেন। শাস্ত্রে তাঁহার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে— ব্যাসদেব স্বয়ং নারায়ণ।

শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথিটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিকামী মানুষ এই দিন নিজ নিজ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আত্মশক্তিতে ভরপুর হইয়া উঠেন। আত্মোন্নতির নিমিত্ত ভারতবর্ষে স্বয়ং ঈশ্বর ও অবতারপুরুষদিগকেও স্বীয় গুরু গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ভগবান শ্রীরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও গুরু গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ও কৃপায় বিশ্ব বিজয় করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের অনুগামীগণও এই তিথিতে গুরুপূজা, গুরুকীর্তন ও গুরুসেবায় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে প্রতীকী গুরুর ধারণাও রহিয়াছে। শিখপন্থের অনুগামীগণ গুরু গ্রন্থসাহিবকে জীবন্ত গুরুরূপে পূজা করিয়া থাকেন। গুরু যেহেতু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শিক্ষাদাতা, তাই নেপালে গুরুপূর্ণিমা তিথি 'শিক্ষক দিবস' রূপে পালিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ত্যাগ, শৌর্য-বীর্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক পরমপবিত্র গৈরিকধ্বজকে গুরু রূপে গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র সাধনায় ব্রতী রহিয়াছে। এই দিন দেশব্যাপী সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ কায়মনোবাক্যে গৈরিকধ্বজের পূজা করিয়া সংবৎসরের সঞ্চিত অর্থ রাষ্ট্রসেবার নিমিত্ত গুরুর চরণে সমর্পণ করিয়া থাকেন। তাহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে, জীবনে তাহারা এই সমাজ হইতে যতটুকু গ্রহণ করিয়াছেন, রাষ্ট্রসেবার নিমিত্ত যেন তাহার অধিক সমাজকে প্রদান করিতে পারেন। গুরুপূর্ণিমা তিথি আদিকাল হইতেই গুরু-শিষ্যের পবিত্র সম্পর্কসূচক পর্ব। ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরাগত এই পবিত্র দিনেই ভারতে 'শিক্ষক দিবস' পালিত হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত। স্বস্তিকা পত্রিকার মাধ্যমে বিষয়টি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল।

সুভাষিতম্

বাচা দত্তং মনসা দত্তং কৃতং চ ন চ কীর্তয়েৎ।
কীর্তনাৎ ক্ষীয়তে পুণ্যং তস্মাৎ পুণ্যং ন কীর্তয়েৎ।।

অর্থ ঃ যে দান কথার দ্বারা, মনের দ্বারা অথবা কাজের দ্বারা করা হয়েছে, তা কখনোও প্রচার করা উচিত নয়। কারণ নিজের পুণ্যকর্মের প্রচার করলে সেই পুণ্যের ফল ক্ষয় হয়ে যায়। তাই নিজের পুণ্যকর্ম বা দানের কথা প্রকাশ করা উচিত নয়।

পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক নয় তাই ময়লা পরিষ্কারের পাশাপাশি ঘরও গোছাতে হবে

তেলাপোকা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ। ২০৩০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের শতবর্ষ। স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কোতে সে খেলা হবে। ৪ মে তস্কর সরকার ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের অনেকের এখন নেই কাজ তো খই ভাজ। কিছু ব্যক্তি তেলাপোকা, তাই জেগে উঠেছে। তস্কর সরকার পতনের একমাস পর বিশ্বকাপ শুরু হয়। তাই তস্কর প্রজাতি তা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। শুনেছি দিল্লির আরশোলা আর তেলাপোকা দলের অনুপ্রেরণায় তারা এখানে গুমটি বানাচ্ছে। ভারত বিরোধী কিছু বিদেশি গুন্ডা যাদের 'ডিপ স্টেট' বলে তার পিছনে রয়েছে। তস্কর শাসকের কিছু অনুগামী দিল্লির তেলাপোকাদের সঙ্গে মিশেছে। কেউ ছোটো ব্যবসায়ী, কেউ-বা শ্রমিক ঠকাতে পনেরো বছর ধরে তস্করদের সঙ্গ দিয়েছিল। তারা দিল্লির নাটুকে তেলাপোকা আর আরশোলাদের ধরে বাঁচতে চাইছে।

বিজেপিকে অন্তত ৬০ মাস রাজত্ব করার পরোয়ানা দিয়েছে ভোটার। তা বাড়তেই পারে। কারণ ৬০ মাস পরে এ রাজ্যে বিরোধী বলে আর কিছু থাকবে না। কেবল রং চং মেখে সান্ধ্য টেলিভিশনের বকবক সোসাইটির সদস্য হয়ে কয়েকজন মুখ দেখাবে। শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে নতুনভাবে যে কাজ নতুন সরকার করছে তাতে বাহবা দেওয়ার কিছু নেই। এটাই জনকল্যাণকামী শাসকের কাজ। তার জন্য অহেতুক সংবর্ধনা আর নানান পুরস্কার দেওয়া বন্ধ হওয়া দরকার। তা কেবল জনগণের প্রাপ্য। কোনো ব্যক্তির নয়।

লক্ষ্য করার বিষয় একটাই। যে কাজ এতদিন করা যায় না বলে ভাবা হতো তা অনায়াসে হচ্ছে। মুসলমান তোষণ বন্ধ হয়েছে। গুন্ডাবাজি আর রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাচ্ছে না। আমুল আর মিৎসুবিশির মতো শিল্প সংস্থা এখানে লগ্নি করবে। তস্কর সরকারের নেত্রী টাটা কোম্পানিকে রাজ্য থেকে সরতে বাধ্য করেছিল। টাটারা আবার ফিরে আসছে।

যারা এতদিন ভোট দিতেন না এবার তারা ভোট দিয়েছেন। সরকারের বহু কাজে তারা নজর রাখছেন। বিজেপি দলের ক্ষমতায় আসা নিয়ে কেউ যদি গ্রন্থ লেখেন 'রাইজ অব দ্য বেঙ্গলি ভদ্রলোক ইন ২০২৬ বেঙ্গল ভোট' তাহলে তা বেস্ট সেলার হতো। কিছু ফড়ে অহরহ প্রশ্ন তুলছে বিজেপি কেন তস্কর পার্টি থেকে লোক নিচ্ছে। কেন তস্কর দলের মূল পাণ্ডা আর তার পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। বিশেষ করে দলের অকর্মণ্য এক সেনাপতিকে। এরা সকলেই তস্কর দলকে ভোট দিয়েছিল। তারা বিশ্বাস করত না যে বিজেপি দল ক্ষমতায় আসতে পারে। এখন তারা হঠাৎ বিজেপি-দরদি সেজে বিজেপিকে বাঁচানোর তাগিদ দেখাচ্ছেন।

এই তেলাপোকাদের নিয়ে সমস্যা। কীটনাশক ব্যবহার করে এদের মেরে দেওয়া গেলেও এরা কিন্তু রক্তবীজের মতো ছড়িয়ে পড়ে আর সর্বত্র বাঁচতে থাকে। একজন তো প্রশ্ন করলেন তাহলে কি আবার নতুন ভাবে তস্কর দলের কিছু সদস্যের সঙ্গে সমঝোতা হলো? সাত দশকের গোড়ায় বিপ্লবী, অভুক্ত আর আধা কবিরা 'হাংরি জেনারেশন' কথা চালু করে। পরে তা 'অ্যাংরি' হয়ে যায়। পুলিশি তোপে তা মিলিয়ে যায়। এদের কাজ ছিল দেশ বা ভারত ভিন্ন বা বিরোধী যা কিছু তা সমর্থন করা। তাদের কাছে ভারত সরকার শোষণ করে আর বড়লোকের পদলেহী যন্ত্রমাত্র।

১৫ আগস্টের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার শিল্পনীতি ঘোষণা করবে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে তস্কর সরকার নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিল। তারপর থেকে শিল্প নিয়ে কুমিরছানার যে গল্প তারা প্রতি বছর ফাঁদত তার বিস্তারিত বিবরণ রাজ্যপাটে লেখা হয়েছে। ১২ বছর ধরে কেবল মিথ্যার বেসাতি করে তস্কর সরকার শিল্প নিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিত। একটি বিশেষ বণিকসভাকে রাজকোষ থেকে আনুমানিক ৩০০ কোটি টাকার বেশি তারা সাহায্য করে। সেই বণিকসভার এক মধ্যস্থতাকারীকে রাজ্যের মন্ত্রী করেছিল তস্কর সরকার।

আধা-কবি আর অভুক্ত বিপ্লবীদের একটি প্রিয় কবিতার চিত্র ছিল 'ত্যালাপোকার আত্মকাহিনী'। প্রায় মরা একটি তেলাপোকার ছবি এঁকে তারা সমাজের চিত্র তুলে ধরত। কয়েকদিন আগে এক সবজান্তা সম্পাদক পরিবর্তনের রাজনৈতিক মাত্রা মাপতে গিয়ে পক্ষান্তরে নিজেকে তেলাপোকাতেই পরিণত করেন। বুঝতে পারেননি ২০২৬-এর পরিবর্তনের সঙ্গে অন্য কোনো পরিবর্তন মেলানো যায় না। ভারত বিরোধী সংস্কৃতি মাথায় ধরে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের ক্ষমতায় আসার পরিবর্তন যে ঘর গোছানোর পদক্ষেপ তা তেলাপোকারা কোনোদিন বুঝতে পারবে না। তেলাপোকা মেরে তা বোঝাতে হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

এত উন্নয়ন চাই না

একেলাযু দিদি,

একুশে জুলাই চলে গেল। কী ছিল আর কী হলো! এসবের মধ্যেই দিদি আপনাকে বারবার হারানোর ছক কষেছে রাজ্যের নতুন সরকার। এটা ঠিক নয়। আমি আপনার পক্ষ নিয়েই বলছি, এত উন্নয়ন চাই না।

তবে সে কথায় কান দেবে বলে মনে হয় না সরকারটা। যা শুনছি তাতে সাধারণ মানুষের হাতে কাজ দেওয়া থেকে গ্রামোন্নয়নের রাস্তা খুলে গেল। ৮২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প শুরু করা যাবে। কিন্তু এত টাকা থাকলেও আগের মতো কাজ আটকে থাকবে না তো! এই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে অনেকের মনে। আমিও সেটাই চাই যে আটকে থাকুক। কিন্তু দিদি এই সরকারটা অন্য ফন্দি এটেছে।

আপনার আমলে কী সুন্দর রাজ্যে রেল, সড়ক, মহাসড়ক, মেট্রো-সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্প আটকে ছিল। মোট ৮২,৪৯২ কোটি টাকার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। আর রাজ্যে পালাবদলের পর সেই কাজে কিছুটা গতিও এসে গেছে।

এবার রাজ্যে কেন্দ্রের ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজ রাজ্যে ফিরছে নতুন মোড়কে। ১২৫ দিনের কাজ বা 'জিরামজি' প্রকল্পে ন্যূনতম মজুরিও বাড়ল। আর এই প্রকল্পের জন্য ঘোষণামতোই ৩১ মার্চ পর্যন্ত সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করল নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান।

আর্থিক ক্ষমতার কাঠামোয় বড়ো পরিবর্তনের পথেও নাকি রাজ্য সরকার। পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা সরিয়ে তা সরকারি আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতির বড়ো অংশের উৎস এই আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। তাই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই বিধানসভায় সংশোধনী বিল আনা হবে। আপনার আমলের মতো এখন আর নাকি পঞ্চায়েতের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এ সংশোধন আনার প্রস্তুতি চলছে।

পালাবদলের পরে তো দিদি দিকে দিকে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাচ্ছে। দায়িত্ব ছাড়ার হিড়িক তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জেতা পুরসভা-পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পদাধিকারীদের। যাঁরা দায়িত্ব ছাড়েননি, তাঁদের অনেকে নিত্য কাজকর্ম সম্পর্কে কার্যত নির্লিপ্ত। ফলে নিবিড় ভাবে ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রকল্প ভিবি-জি রাম জি (বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ) দ্রুত কার্যকর করা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে প্রশাসনেরই অন্দরে। দেশে গত ১ জুলাই থেকে চালু হয়েছে ভিবি-জি রাম জি। কিন্তু রাজ্যের ৩৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তা চালু করা গিয়েছে ৪০০টির মতো পঞ্চায়েতে। কারণ, বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানেরা হয় দায়িত্ব পালন করছেন না, না হয় তাঁদের হদিসই নেই। ১৪,১৮০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে এই প্রকল্পে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতেই প্রায় ১১ হাজার শূন্যপদ তথা কর্মীসঙ্কট রয়েছে। আপনিই দিদি দায়িত্ব নিয়ে সেটা করে রেখে গেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই সেই হার প্রায় ৪০ শতাংশ। যদিও কিছু দিন আগে প্রায় সাড়ে ছ'হাজার শূন্যপদ পূরণে ছাড়পত্র দিয়েছে নবান্ন। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ৫৫০৯, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৫৬৪ এবং জেলা পরিষদ স্তরে ৪৬৩টি পদ পূরণ হবে। দেখছেন দিদি, আমি বলছিলাম না আপনাকে পদে পদে হারানোর ছক চলছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়েও বড়ো সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাজ্যের অনুরোধে আবাস যোজনার তালিকা তৈরির সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে কেন্দ্রের পক্ষে। ঠিক ছিল ২০ জুনের জায়গায় সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ আগস্ট আমাদের রাজ্যের জন্য। আবার ভারত সরকার চারটি জেলাতে--- দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, বীরভূম ও পুরুলিয়ায় প্রধানমন্ত্রী ধনধান্য প্রকল্প চালু করেছে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ২৪০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরির অনুমোদন হয়ে গিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে কাজের জন্য এক হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

মালদহে আম, লিচু-সহ বিভিন্ন ফলের উৎপাদনের জন্য ১০০ কোটি টাকার প্রকল্পে অনুমোদন মিলেছে। আলু, পাটের বীজ মূলত ভিনরাজ্য থেকে আমদানি করা হয়। ভবিষ্যতে এ রাজ্যে যাতে আলু, পাটের বীজ উৎপাদন সম্ভব হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত রাজ্যকে জানানো হয়েছে যে, পূর্ব ভারতের জন্য বীজ উৎপাদনের হাব হবে পশ্চিমবঙ্গে।

স্পষ্ট করে বলছি, আমাদের দিদিকে বারবার হারানোর জন্য এত উন্নয়ন চাই না। চাই না— চাই না। □

বন্দনীয়া মৌসিজী—এক চিরন্তন আদর্শ

আজকের নারীসমাজের জন্য এক অনন্ত প্রেরণা

ড. মৌমিতা বর

'যে নারী নিজের শক্তিকে চিনতে পারে, সে শুধু নিজের জীবনই বদলায় না; সে একটি পরিবার, একটি সমাজ এবং একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে।' এই সত্যকে নিজের সমগ্র জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী বন্দনীয়া লক্ষ্মীবাঈ কেলকর— আমাদের সবার প্রিয় বন্দনীয়া মৌসিজী।

বর্তমান যুগে নারীশক্তির ক্ষমতায়ন নিয়ে সর্বত্র আলোচনা চলছে। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নেতৃত্ব ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সমাজে পারিবারিক ভাঙন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার মতো সংকটও ভীষণ রূপে প্রকট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন জাগে--- প্রকৃত নারীশক্তির ভিত্তি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজে পাই বন্দনীয়া মৌসিজীর জীবনদর্শনে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম নারী। কারণ নারীই শিশুর প্রথম শিক্ষক, পরিবারের সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু এবং জাতির চরিত্রগঠনের প্রধান ভিত্তি। তাই নারীর জাগরণ মানেই সমাজের জাগরণ, আর সমাজের জাগরণ মানেই দেশের পুনর্জাগরণ।

বন্দনীয়া মৌসিজীর জীবন ছিল সংগ্রাম, ত্যাগ ও আদর্শের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিগত দুঃখ কিংবা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তাঁকে কখনো দুর্বল করতে পারেনি। বরং প্রতিটি প্রতিকূলতা তাঁর সংকল্পকে আরও দৃঢ় করেছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা যথেষ্ট নয়; চরিত্রবান, আত্মবিশ্বাসী ও আদর্শনিষ্ঠ নাগরিক গড়ে না উঠলে জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। এই উপলব্ধিই তাঁকে নারীদের নিয়ে একটি

সুসংগঠিত চরিত্রগঠনমূলক আন্দোলনের স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করে।

ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন একজন অতিসাধারণ মানুষ তাঁর অদম্য সংকল্প, সুদূরপ্রসারী চিন্তা এবং আত্মনিবেদিত কর্মের মাধ্যমে একটি যুগের গতিপথ পরিবর্তন করে দেন। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী বন্দনীয়া লক্ষ্মীবাঈ কেলকরের জীবন সেই বিরল ইতিহাসেরই এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ভারতীয় গৃহিণী। সংসারের দায়িত্ব পালন, সন্তানের লালন-পালন, সমাজজীবনের নানা কর্তব্য— এসবই ছিল তাঁর নিত্যদিনের বাস্তবতা। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অসাধারণ। তিনি বুঝেছিলেন, একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার মায়েদের চরিত্র, সংস্কার ও নেতৃত্বের উপর। তাই তিনি মনে করতেন, যদি নারীকে সুসংগঠিত ও আদর্শবান করে তোলা যায়, তবে সমগ্র সমাজকে নতুন ভিত্তির উপর দাঁড় করানো সম্ভব।

সময়টা ছিল এমন, যখন ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন যত জোরদার হচ্ছিল, ততই স্পষ্ট হচ্ছিল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি প্রয়োজন সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক পুনর্জাগরণ। সমাজের বহু স্থানে নারীরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সংগঠিত জীবনের অভিজ্ঞতা সীমিত এবং জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রও ছিল খুবই সংকীর্ণ। বন্দনীয়া মৌসিজী উপলব্ধি করলেন— নারীরা যদি কেবল দর্শক হয়ে থাকেন, তবে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। তাঁদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস, শারীরিক সক্ষমতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বন্দনীয়া মৌসিজী সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে। তিনি জানতে চান— পুরুষদের জন্য চরিত্রগঠনমূলক সংগঠন যদি সফলভাবে কাজ করতে পারে, তবে নারীদের জন্য তেমন একটি স্বতন্ত্র সংগঠন কেন হবে না?

ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন। গভীর আলোচনায় সুস্পষ্ট হয় যে, নারীদের সংগঠন নারীরাই পরিচালনা করবেন তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজন, দায়িত্ব ও সামাজিক ভূমিকার আলোকে। তিনি মৌসিজীকে উৎসাহিত করেন এবং বলেন, যদি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণের দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, তবে প্রয়োজনে তাঁকেই এগিয়ে আসতে হবে। তবে সংগঠনটি হবে স্বতন্ত্র— নিজস্ব নেতৃত্ব, নিজস্ব কার্যপদ্ধতি এবং একই রাষ্ট্রীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ। এই আলোচনা ছিল ভারতীয় নারীজাগরণের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এখান থেকেই একটি নতুন

অধ্যায়ের সূচনা হয়। ডাক্তারজীর আশীর্বাদে বন্দনীয়া মৌসিজীর হাত ধরে ১৯৩৬ সালের ২৫ অক্টোবর, বিজয়া দশমীর পুণ্যতিথিতে নাগপুরে 'রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি'র আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। এটি কেবলমাত্র একটি নতুন সংগঠনের জন্ম ছিল না; এটি ছিল ভারতীয় নারীর আত্মশক্তি জাগরণের এক ঐতিহাসিক আহ্বান।

প্রথমদিকে পথ মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু সমাজের নানা সংশয়, কুসংস্কার ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও বন্দনীয়া মৌসিজী পিছিয়ে যাননি। তিনি নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারের লোকেদের বোঝাতেন, কিশোরী ও মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করতেন এবং ছোটো ছোটো শাখার মাধ্যমে সংগঠনের ভিত্তি গড়ে তুলতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল— কোনো মহান কাজ সহজে সম্পন্ন হয় না; প্রতিকূলতা যত বেশি, সংকল্প তত দৃঢ় হওয়া উচিত।

মৌসিজীর নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মাতৃসুলভ আচরণ। তিনি আদেশ দিয়ে নয়, ভালোবাসা, আত্মীয়তা ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে মেয়েদের গড়ে তুলতেন। প্রত্যেক সেবিকার সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়াতেন, ভুল করলে ধৈর্যের সঙ্গে সংশোধন করতেন এবং সাফল্যে আন্তরিকভাবে উৎসাহ দিতেন। তাই তিনি শুধু নেতা নন, সকলের প্রিয় 'মৌসিজী' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, প্রকৃত নেতার কাজ অনুগামী তৈরি করা নয়; নতুন নতুন নেতা গড়ে তোলা। এই কারণেই তিনি প্রত্যেক সেবিকার মধ্যে আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বের গুণ বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

তাঁর কাছে শাখা ছিল চরিত্রগঠনের পাঠশালা। সেখানে শারীরিক অনুশীলনের পাশাপাশি স্বদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রার্থনা, শৃঙ্খলা, সমাজসেবা ও আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি মনে করতেন, শক্তি ও সংস্কারের সমন্বয়েই পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সমাজে যখনই কোনো দুর্যোগ বা মানুষের দুর্দশা দেখা দিয়েছে, তিনি সেবিকাদের নিয়ে সেবাকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর কাছে সেবা ছিল মানবতার প্রতি কর্তব্য; প্রচারের মাধ্যম নয়।

মৌসিজী কখনো নারীর শক্তিকে পুরুষ বিরোধিতার আলোকে দেখেননি। তাঁর মতে, নারী ও পুরুষ সমাজরূপী রথের দুই চাকা। একজনের উন্নতি অন্যজনকে ছোটো করেনা; বরং পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও পরিপূরকতার মধ্য দিয়েই সমাজ এগিয়ে যায়। আজকের সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি সংসার ত্যাগ করে সমাজনেতৃত্ব দেননি; বরং সংসারের দায়িত্ব পালন করেই সমাজজীবনে এক অনন্য আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, একজন ভারতীয় গৃহিণী চাইলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র— তিন ক্ষেত্রেই সমান নিষ্ঠার সঙ্গে অবদান রাখতে পারেন। তাঁর মতে, প্রকৃত ক্ষমতায়ন কেবল অধিকার বা অর্থনৈতিক সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তার ভিত্তি হলো আত্মশক্তি, চরিত্র, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় দায়িত্ববোধ।

আজকের দিনে ভারতীয় নারীরা বিজ্ঞান, শিক্ষা, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, ক্রীড়া, শিল্প ও প্রযুক্তি-সহ নানা ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন। এই অগ্রগতি অবশ্যই গৌরবের। কিন্তু মৌসিজী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, বাহ্যিক সাফল্যের পাশাপাশি অন্তরের শক্তি, নৈতিকতা, আত্মসংযম, পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন আদর্শ নারী শুধু নিজের পরিবারের নয়, সমগ্র সমাজের পথপ্রদর্শক হতে পারেন। তাই মাতৃত্ব তাঁর কাছে কেবল পারিবারিক পরিচয় নয়; জাতিনির্মাণের এক মহৎ দায়িত্ব।

বর্তমান সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার প্রবণতা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন বন্দনীয়া মৌসিজীর শিক্ষা নতুন তাৎপর্য লাভ করে। তিনি শিখিয়েছেন— সমাজ পরিবর্তনের জন্য বড়ো বড়ো বক্তৃতার প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন নিজের জীবনকে একটি আদর্শে গড়ে তোলা। একজন সৎ, শৃঙ্খলাবদ্ধ, সেবাপরায়ণ ও দেশপ্রেমিক নারী তাঁর পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজে নীরবে যে পরিবর্তন আনতে পারেন, তা বহু বৃহৎ বৃহৎ আন্দোলনের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মাধ্যমে তিনি যে আদর্শের বীজ বপন করেছিলেন, আজ তা দেশের নানা প্রান্তে চরিত্রগঠন, সমাজসেবা, সাংস্কৃতিক জাগরণ ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় বিকশিত হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়; এটি এমন এক বিদ্যালয়, যেখানে নারী নিজেকে জানে, নিজেকে গড়ে তোলে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য নিবেদিত জীবনযাপনের শিক্ষা লাভ করে।

বন্দনীয়া মৌসিজী ইতিহাসের একটি নামমাত্র ছিলেন না; তিনি ভারতীয় নারীশক্তির এক চিরন্তন প্রতীক। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়— একজন আদর্শ নারী কেবল নিজের ভাগ্যই নির্মাণ করেন না, তিনি একটি পরিবার, একটি সমাজ এবং একটি জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলেন। তাই আজকের এই পবিত্র দিনে, বন্দনীয়া মৌসিজীর পুণ্য জন্মতিথিতে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম তখনই অর্থবহ হবে, যখন আমরা প্রত্যেকে তাঁর আদর্শকে জীবনে ধারণ করে আত্মগঠন, সংগঠন, সেবা ও রাষ্ট্রনিষ্ঠ জীবনের পথে অগ্রসর হব।

বন্দনীয়া মৌসিজীর জীবন আমাদের আহ্বান জানায়— নিজেকে গড়ো, সমাজকে গড়ো ও ভাবী তেজস্বী হিন্দুরাষ্ট্রের জননী হও। এই আদর্শই হোক প্রতিটি ভারতীয় নারীর শক্তি, প্রতিটি পরিবারের প্রেরণা এবং ভবিষ্যৎ ভারতের দৃঢ় ভিত্তি।

(বন্দনীয়া মৌসিজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

শোকসংবাদ

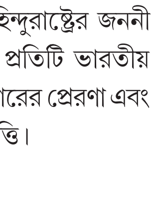

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্ম প্রসার বিভাগের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত পরিযোজনা প্রমুখ ব্রজেন্দ্রনাথ সরকারের মা সুকিতা সরকার গত ১৭ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কেন 'পরমগুরু'?

'বিজ্ঞান'-এর অর্থ হলো বিশেষ জ্ঞান। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিণীত সত্যই হলো 'বিজ্ঞান'। সত্যই পদার্থবিদ্যায় বহু গবেষণা হয় যুগ যুগ ধরে। তার মধ্যে কিছু গবেষণালব্ধ জ্ঞান যুগান্তকারী। কিছু গবেষক তাঁদের অসাধারণ গবেষণার মাধ্যমে যুগের পরিবর্তন এনেছেন। আইজ্যাক নিউটন, ডারউইন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, মাদাম মেরি কুরি, টমাস আলভা এডিসন, নিকোলা টেসলা-সহ পাশ্চাত্যের কয়েকজন বিজ্ঞান গবেষক বিশ্বে নতুন যুগ এনেছেন। যাঁদের অধীত বিদ্যা এবং সেই বিদ্যা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার যদি তক্ষশিলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তবে মানবসভ্যতা পিছিয়ে যাবে কয়েক যুগ। তেমন ভাবে 'বেদ' হলো মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়। যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ্বজনীন মানবধর্ম।

এই বেদ ও সনাতন ধর্ম যদি হারিয়ে যেত, তবে হারিয়ে যেত মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাসমূহ। বাকি উপাসনা পদ্ধতি যা পড়ে থাকত তাতে একমাত্র এক ধরনের মতাবলম্বীদের সঙ্গে আরেক মতাবলম্বীর 'ঈশ্বর'-এর প্রতিযোগিতা ছাড়া এই বিশ্বে আর কিছু টিকে থাকত না। কারণ অন্যান্য উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণকারীদের তত্ত্ব বা দর্শনের মূল পার্থক্য প্রায় নেই। একমাত্র সনাতন হিন্দুধর্ম বলে— 'আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক।' বেদ-বেদান্ত এক অনন্ত বিজ্ঞান; যে বিজ্ঞান সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য— 'মুক্তি'। যে বিজ্ঞান সাধনার অন্যতম পথপ্রদর্শক হলেন জগদ্‌গুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। আর তাই মহর্ষি ব্যাসদেবকে বলা হয় 'গুরুশ্রেষ্ঠ' এবং তাঁর আবির্ভাবতিথিকে বলা হয়— 'শ্রীগুরুপূর্ণিমা'।

পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদের বক্তব্য অনুযায়ী সিন্ধু নদের এপারে যে ধর্ম পালন করা হতো তাকে বলা হয়— 'বৈদিক ধর্ম'। যদিও অনাদি কাল হতে ভারতীয় মুনি-ঋষিরা বিশ্বের বুকে বেদ রচনা ও বেদ অধ্যয়নের সাধনা করেছিলেন। স্মরণাতীত কাল ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিশ্বের বুকে প্রবাহিত হয়েছিল সেই আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানচর্চা ও প্রজ্ঞার প্রবাহ। বেদ অধ্যয়ন ও বৈদিক উপাসনার ক্ষেত্রে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড হলো মুখ্য। গুরুমুখী বিদ্যা 'কর্মকাণ্ড'-এর মূল মাধ্যম ছিল 'যজ্ঞ' এবং এই হোমযজ্ঞ থেকেই পূজার্চনার উৎপত্তি। ঋষিরা মানুষের মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করানোর জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। কোনো একজন ঋষি এই সনাতন হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নন। হাজার হাজার বছরের বৈদিক জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের পদ্ধতিকে প্রথমে একত্রিত করেন মহর্ষি ব্যাসদেব। বৈদিক শ্লোকসমূহকে সংকলনের পর 'বেদ'কে তিনি চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। যে মন্ত্রগুলি বৈদিক দেবদেবীসমূহের স্তব-স্তুতি, তার সংকলন হলো ঋগ্বেদ এবং এর মন্ত্রগুলিকে বলা হয়— 'ঋচা'। যজ্ঞানুষ্ঠান ও আহুতি দানের প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় যজুর্বেদ হতে। যে মন্ত্রগুলি গীত হয় (সামগান), তার সংকলন হলো--- সামবেদ। অন্যান্য শ্লোকগুলির সংকলন হলো--- অথর্ব বেদ। এরপর উনি সংহিতাগুলিকে একত্রিত করলেন। তারপর ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। আর একদম শেষে উপনিষদ। বেদের শেষের দিকে অংশ হওয়ার কারণে উপনিষদসমূহের নাম হলো— বেদান্ত। এই 'অন্ত'-এর অবশ্য দু'টি পৃথক অর্থ রয়েছে বলে মনে করা হয়। একটা 'শেষ' (অর্থাৎ বেদের শেষ)। অপরটি 'উপসংহার' বা বেদচর্চার উদ্দেশ্যপূর্তি। অর্থাৎ এতগুলি বেদ ও উপনিষদে যা বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য একটিই। তা হলো— 'মুক্তি'। মানুষকে 'মুক্তি'র দিকে নিয়ে যাওয়া। যা অন্য কোনো শাস্ত্র বা মতপথে বর্ণিত হয়নি। এই বিজ্ঞান হলো 'মানবমুক্তির বিজ্ঞান'। ভারতবর্ষের গুরু-শিষ্য পরম্পরার ঐতিহ্য অনুযায়ী গুরু বেদব্যাস তাঁর চারজন প্রধান শিষ্যকে চতুর্বেদের মৌখিক পাঠ প্রদান করেন। তাঁরা হলেন পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনী ও সুমন্ত্র। এই শিষ্যরা তাঁদের শিষ্যবর্গের মাধ্যমে চতুর্বেদের মৌখিক সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও প্রচার অব্যাহত রাখেন। ছন্দ, স্বরলিপি, তাল ও পুনরাবৃত্তির বিশেষ পদ্ধতির কারণে 'শ্রুতি'র মাধ্যমে এই বৈদিক মন্ত্রাদি ভারতবর্ষে রক্ষিত হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী।

মহর্ষি ব্যাসদেব ভারতীয় বেদ ও উপনিষদ শাস্ত্রের দর্শনকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য রচনা করলেন ভাগবত পুরাণ ও দ্বাপর যুগের ইতিবৃত্ত-স্বরূপ মহাকাব্য 'মহাভারত'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই মহাভারতেরই অংশ যা সনাতন ধর্ম ও মানব জীবন দর্শনের উপসংহার বলা যায়।

এছাড়াও যে বিজ্ঞান বা দর্শনের জন্য মহর্ষি বেদব্যাস সকলের গুরু তা হলো স্রষ্টা, সৃষ্টি, আত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক নিয়ে তাঁর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা, যে দর্শনগ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'বেদান্তসূত্র'। উপনিষদসমূহের ৫৫৫টি শ্লোক সংবলিত এই 'বেদান্তসূত্র' সনাতন ধর্মকে পৃথিবীর সব উপাসনা পদ্ধতির থেকে পৃথক করেছে। সৃষ্টির এই বিজ্ঞান হলো অনন্য ও অনবদ্য।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বাস করতেন যে, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তিনি মনে করতেন প্রকৃতির গভীরে সত্যের সন্ধান করাটাই প্রকৃত ধর্মাচরণ ও বিজ্ঞান সাধনা। আধুনিক কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কণা ও শক্তির যে অখণ্ডতার কথা বলা হয়েছে তার ভিত্তি হলো সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত তত্ত্ব। এই তত্ত্বই 'মাস-এনার্জি ইক্যুইভ্যালেন্স থিওরি'র অন্যতম ভিত্তি। তিনি ভারতীয় অদ্বৈত তত্ত্বর সঙ্গে পৃথিবীর সৃষ্টি ও প্রাণের সৃষ্টির সাদৃশ্য খুঁজে পান। উপনিষদের মূল মন্ত্র হলো— 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ও অখণ্ড।

তাই প্রতিবছর শ্রীগুরুপূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে সমগ্র বিশ্ব পরমগুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে স্মরণ করে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে কোয়ান্টাম ফিজিক্স বা থিওরি অফ রিলেটিভিটি বাদ দিলে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা যেমন অনেকটা পিছিয়ে যায়, তেমনই মহর্ষি ব্যাসদেব লব্ধ জ্ঞান বিবর্জিত হলে পিছিয়ে যায় সমগ্র মানবসভ্যতা। □

বারুইপুরকাণ্ডে ঘোলা জলে মাছ ধরতে গিয়ে ভাবের ঘরে চুরি মমতা ব্যানার্জির, খসে পড়ল মুখোশ

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

বারুইপুরে বছর বারোর এক নাবালিকাকে প্রথমে যৌন নির্যাতন এবং পরে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যবাসীকে সুশাসন উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাই ঘটনার পর পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছুটে গিয়েছেন বারুইপুরে। দেখা করেছেন নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে। আশ্বাস দিয়েছেন ঘটনার ঠিকঠাক তদন্তের, ছাড়া হবে না দোষীদের, রেয়াত করা হবে না কাউকেই। এলাকায় একটি পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি এবং দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুবাবু দেন বারুইপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে। রাজ্যে পালাবদলের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আশ্বাসেই হয়েছে কাজ। আগে যেখানে মুখ্যমন্ত্রীরা যেতেন এবং 'মিথ্যে' স্তোকবাক্য শোনাতেন, নয়া রাজ্য সরকারের প্রধান শুভেন্দু অধিকারী যে ঠিক তেমন নন, মাত্র মাস দুয়েকের প্রশাসনিক কাজকর্মে তা বুঝে গিয়েছেন রাজ্যবাসী। তাই যতই দিন যাচ্ছে, ততই তাঁদের আশা-ভরসা বাড়ছে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর। এই আবহেই ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্য ছিল, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল নেত্রীর পায়ের নীচ থেকে যে মাটি সরে গিয়েছে, তা ফেরানো। একই সঙ্গে বাজিয়ে দেখা জনতা জনার্দনের মতামতের ঢোল। এর আগের পর পর তিনটে বিধানসভা নির্বাচনে বোল তুলেছিল তৃণমূলের ঢোল, ছাব্বিশে ভোটের পর পুরানো সেই মৃদঙ্গটি আবারও একই সুর তোলে কিনা, তা-ই বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী। সেটা করতে গিয়েই আদতে তিনি নিজেই পুড়িয়েছেন নিজের মুখ।

বারুইপুরকাণ্ডকে খড়কুটো ভেবে আঁকড়ে ধরে (যেহেতু এখন আর কোনও হাতেগরম ইস্যু আপাতত নেই) ভেসে থাকার চেষ্টা করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। কালীঘাটে হেঁটেছিলেন প্রতিবাদ মিছিলে। মহিলাদের নিরাপত্তা, অপরাধীদের শাস্তি এবং সামাজিক প্রতিরোধের বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। রাজনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় তার এই পদক্ষেপ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই মিছিলের পরই নতুন করে সামনে এসেছে এক পুরানো বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর একাধিক মন্তব্য— যেগুলি দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধীদের সমালোচনার নিশানায় ছিল।

রাজনীতি কিংবা সমাজনীতি সর্বত্রই 'স্মৃতি' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যখন কোনও নেতা কিংবা নেত্রী নৈতিক অবস্থান থেকে প্রতিবাদের ভাষা গ্রহণ করেন, তখন তাঁর অতীতের বক্তব্যও জনসমক্ষে ফিরে আসে। ফলে কালীঘাটে তৃণমূল সুপ্রিমোর এই মিছিল নিছক একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি নয়, এটি একই সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রাপথের বক্তব্য, অবস্থান এবং ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর এই প্রয়াসে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন চূড়ান্তভাবে।

> **ছাব্বিশের নির্বাচনে নেত্রীর মাজা ভেঙে দিয়েছে রাজ্যবাসী। আর নেত্রী গাড্ডায় পড়তেই তার উচ্ছিষ্টলোভীরা কিংবা ক্ষমতার ক্ষীরের তলানি চেটেপুটে খাওয়া স্তাবকের দল রাতারাতি ধাঁ। ফলে আপাতত ভাঙা কোমর নিয়ে তৃণমূলনেত্রী মুখোশ পরে মুখ আড়ালের চেষ্টা বোধহয় না করলেই পারতেন।**

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নারী নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা কখনোই কেবল আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রায় প্রতিটি বড়ো ঘটনার পরেই শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধীর দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপের পালা। গত দেড় দশকে (এই পুরো 'কালবেলা'জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মমতা ব্যানার্জি) রাজ্যে ঘটে যাওয়া একাধিক বহুচর্চিত ঘটনার পর সরকারের ভূমিকা যেমন প্রশ্নের মুখে পড়েছে, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্যও নানা সময় জন্ম দিয়েছে তীব্র বিতর্কের।

সিপিএমের গড়ে ধস নামিয়ে ২০১১ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। তার বছরখানেকের মধ্যেই ২০১২ সালে ঘটে পার্ক স্ট্রিটে একজন মহিলার সম্ভ্রমহানির ভয়াবহ ঘটনা। সেই সময় তৃণমূলনেত্রী তথা রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ঘটনাটি 'সাজানো' হতে পারে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই একে হাতিয়ার করা হচ্ছে। তার এহেন মন্তব্যে রাজ্যে ওঠেছিল সমালোচনার ঝড়। সোচ্চার হয়েছিলেন মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী এবং নাগরিক সমাজের একটা বড়ো অংশ। পরবর্তীকালে তদন্ত, বিচার এবং দোষীদের সাজা ঘোষণার পর সেই মন্তব্য আরও বেশি বিতর্কিত হয়ে উঠেছিল। সমালোচকদের মতে, অভিযোগকারিণীর প্রতি সামাজিক অবিশ্বাস

ফঃ ২

বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এমনতর মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক ক্ষমতাকে অপব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি।

কামদুনিতে কলেজ ছাত্রীর ওপরে অকথ্য যৌন নির্যাতন ও হত্যার ঘটনাও একইভাবে রাজনৈতিক অভিঘাত তৈরি করেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে স্থানীয় প্রতিবাদীদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করলে, মমতা ব্যানার্জি তার চর্মচক্ষে প্রতিবাদীদের চোখে আগ্নেয়গিরি দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রকাশ্য সভায় তিনি এমন মন্তব্যও করেছিলেন, যা প্রতিবাদী নাগরিকদের প্রতি সহমর্মিতার পরিবর্তে তৈরি করেছিল সন্দেহের পরিবেশ। সেই ঘটনার পর থেকেই এরাজ্যের মহিলা নিরাপত্তার বিষয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান নিয়ে জাতীয় স্তরেও আলোচনা শুরু হয়েছিল।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে একবার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গলা উঁচিয়ে বলেছিলেন— 'আগে কি ধর্ষণ হতো না? এখন মোবাইল এসেছে, মিডিয়া এসেছে, তাই বেশি জানা যাচ্ছে।'

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু ঘটনায় বিরোধীরা একই অভিযোগ তুলেছেন— যে কোনো চর্চিত ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের ঘটনার পর রাজ্য সরকারের প্রথম প্রতিক্রিয়া অনেক সময়ই অপরাধের গুরুত্ব স্বীকার করার বদলে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা তুলে ধরা। কখনও রাজ্য সরকার বা তৎকালীন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাচ্ছে, কখনও কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে সংবাদমাধ্যমকে। ফলে অপরাধ এবং অপরাধের 'শিকার'-এর ন্যায়বিচারের প্রশ্ন অনেক সময় চাপা পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজার ছাইয়ের গাদায়। ফলে একদিকে যেমন 'শিকার'কে থাকতে হয়েছে বোবা-কালা হয়ে, তেমনি তৃণমূলনেত্রীর আমলে উপদ্রব বেড়েছিল 'নারীদেহ শিকারি'দের।

অবশ্য তৃণমূলের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৃণমূলের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ঘটনায় তদন্ত, চার্জশিট এবং বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য রাজ্য সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত, মহিলা থানার সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক নজরদারি এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থার কথাও তারা খাড়া করে অজুহাত হিসেবে। দলের মতে, বিচ্ছিন্ন কিছু বক্তব্যকে সামনে এনে গোটা প্রশাসনিক উদ্যোগকে অস্বীকার করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রাজনীতির আঙিনায় নেতা-নেত্রীদের ভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কোনও অপরাধের পর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রশাসনিক অবস্থানের পাশাপাশি নৈতিক বার্তাও বহন করে। তাই অভিযোগকারীর বক্তব্যকে সন্দেহ করা, ঘটনার নেপথ্যে থাকা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ইঁদুর খোঁজা অথবা অভিযোগকে প্রথমেই খারিজ করে দেওয়া কিংবা লঘু করে দেখার প্রবণতা জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী যখন কোনো অপরাধের তদন্তের আগেই সেই বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করে ফেলেন, তখন কোন প্রক্রিয়ায় তদন্ত এগোবে সেই দিকনির্দেশও পেয়ে যায় পুলিশ-প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রচারিত তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে তারা তখন উঠেপড়ে লাগে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যৌন নির্যাতনের মতো অপরাধে অভিযোগ জানাতেই বহু ভুক্তভোগী সামাজিক লজ্জা, ভয় এবং মানসিক চাপে ভোগেন। সেই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সংবেদনশীল ভাষা প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বারুইপুরের সাম্প্রতিক ঘটনাও এই কারণেই নতুন করে পুরনো বিতর্ককে নিয়ে এসেছে সামনের সারিতে। যখন একই রাজনৈতিক নেত্রী সবুজ মোমবাতি হাতে আজ প্রতিবাদের সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ান, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে— এই অবস্থান কি এই নেত্রীর অতীতের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? নাকি সময়ের ফেরে বদলে গিয়েছে তৃণমূলনেত্রীর রাজনৈতিক ভাষা ও অবস্থান?

রাজনীতিতে অবস্থান পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়। সমাজ বদলায়, রাজনৈতিক বাস্তবতা বদলায়, বদলায় জনমতও। একজন নেতা নিজের অবস্থান সংশোধন করতেই পারেন। কিন্তু তার সেই 'নবকলেবর'কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে অতীতে করা বিতর্কিত মন্তব্যের সমালোচনা, আত্মসমালোচনা, ভুল স্বীকার করা বা নিদেনপক্ষে স্পষ্ট ব্যাখ্যা অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে ওঠে। কারণ জনতা-জনার্দন কেবল বর্তমানের ছবি দেখে না, অতীতকেও নিক্তিতে ফেলে তুল্যমূল্য বিচার করে।

মমতা ব্যানার্জির ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আরও তীব্র। কারণ তিনি প্রায় দেড় দশক ধরে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ছিলেন প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে। তাই কোনও অপরাধের পর তাঁর প্রতিটি মন্তব্য হয়ে উঠেছে প্রশাসনিক বার্তা। আজ বিরোধী রাজনীতির পরিসরে তিনি নিজেকে প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে তুলে ধরতে চাইলে, এরাজ্যে রাষ্ট্রভক্তদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম সরকারকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করতে চাইলে অনিবার্যভাবে তাকে তাড়া করে ফিরবে তারই 'ছায়া'। করেছেও তাই। বারুইপুরকাণ্ডের পর যেই তিনি রাজনীতির ঘোলাজলে গাছকোমর করে শাড়ি পরে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন, তখনই তারই নিজের অতীতে করা মন্তব্য বুমেরাং হয়ে উঠেছে। যে ঘটনাকে তিনি নিজের বেলায় আঁটিসাঁটি করেছিলেন, অন্যের বেলায় সেটাকেই তিনি করে ফেলেছেন দাঁতকপাটি। তবে এতে যে রাজ্যবাসীর মন বিশেষ গলেনি, তা পরিষ্কার হয় প্রতিবাদ মিছিলের বহর দেখে! ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির কৌশলী চাল ধরে ফেলেছেন বঙ্গবাসী, এঁদোয় পড়ে যাওয়া দলনেত্রীর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় তাঁরা যে বিশেষ খুশি হননি, বস্তুত, তার ছবিই ধরা পড়েছে গত ৮ জুলাই সাকুল্যে মিনিট পনেরোর ওই প্রতিবাদ মিছিলে। এদিনের মিছিলে হুড়োহুড়ি সামলানো এক তৃণমূলকর্মীকেও চড় মারেন দলনেত্রী। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় সেই দৃশ্য। রাজ্যবাসী বেশ বুঝেছেন, মানি পাওয়ার, মাস্‌ল্ পাওয়ার হারিয়ে রাজনীতির কানাগলির নেড়ি মস্তানরাও যেমন নির্বিষ হয়ে পড়ে, তেমনি হয়ে পড়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি এখন হেলে সাপের মতো বিষহীন।

ছাব্বিশের নির্বাচনে তাঁর মাজা ভেঙে দিয়েছে রাজ্যবাসী। আর নেত্রী গাড্ডায় পড়তেই তার উচ্ছিষ্টলোভীরা কিংবা ক্ষমতার ক্ষীরের তলানি চেটেপুটে খাওয়া স্তাবকের দল রাতারাতি ধাঁ। ফলে আপাতত ভাঙা কোমর নিয়ে তৃণমূলনেত্রী মুখোশ পরে মুখ আড়ালের চেষ্টা বোধহয় না করলেই পারতেন। □

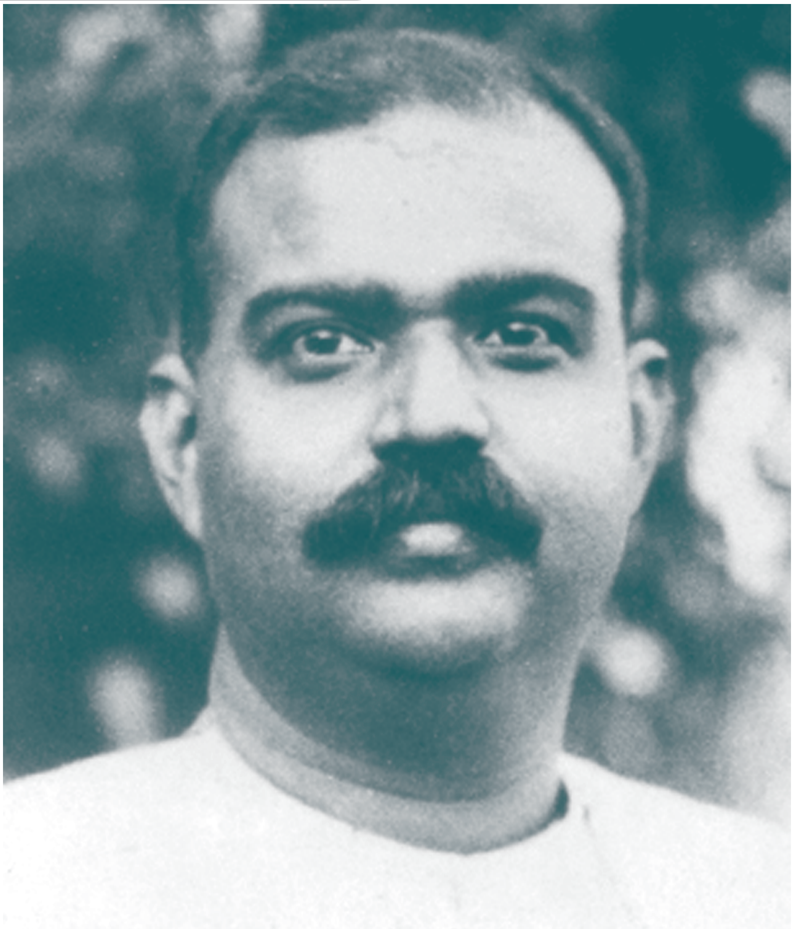

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ নীরবে, নিভৃতে

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়

আজ রাজ্যের সর্বত্র যথোপযুক্ত কারণে ও যথোচিত মর্যাদায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হচ্ছে কারণ যে পশ্চিমবঙ্গে আমরা পরম নিশ্চিন্তে জন্ম নিয়েছি, বড়ো হচ্ছি, নানা অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হচ্ছি এবং জীবন অতিবাহিত করছি, সেই সব যে মানুষটির জন্য সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে, তাঁর নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়া মানুষটি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে পরম নিশ্চয়তায় জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় বাঙ্গালি হিন্দুদের মুসলমানের হাতে পিষে মারার যে চক্রান্ত মুসলিম লিগ করেছিল, যার জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল ৪৬-এর কলকাতা নরসংহার এবং নোয়াখালি হিন্দু গণহত্যা। পাকিস্তানের কবল থেকে বঙ্গের পশ্চিমাংশকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য হোমল্যান্ড তৈরি করে শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লিগের সেই চক্রান্ত ভেস্তে দেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী দাঙ্গা বিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দুদের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেন।

তখন শ্যামাপ্রসাদ বীর সাভারকার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার নেতা। দিনের পর দিন গ্রামে-গঞ্জে, সংবাদপত্রে প্রচার। দিল্লি গিয়ে ইংরেজ শাসকদের কাছে দরবার। কংগ্রেস ও অন্যান্য দলীয় নেতাদের বোঝানোর মাধ্যমে বঙ্গীয় বিধানসভায় আনা প্রস্তাবের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট নিশ্চিত করে বঙ্গ বিভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করা প্রভৃতি। মাত্র ৫৬ বছরের এক মানুষের অনবদ্য কীর্তি হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা যার ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ ও সম্পত্তি হরণ এবং কোনোরকমে তাদের পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ, এমনকী স্ত্রী, কন্যাকে, ছেড়ে এসে, এসবই শ্যামাপ্রসাদের দূরদৃষ্টির বাস্তবতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। পঞ্জাবের ক্ষেত্রেও পূর্ব পঞ্জাবকে আলাদা করে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করে পাকিস্তান থেকে বাধ্য হয়ে পালিয়ে আসা পঞ্জাবিদের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা তাঁর অনুরূপ আর এক কীর্তি। অবিভক্ত বঙ্গ ও পঞ্জাবকে ভাগ করে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া ছিন্নমূল মানুষের আশ্রয় দান ছিল শ্যামাপ্রসাদের অমর কীর্তি যা কংগ্রেস, কমিউনিস্টদের এবং তাদের দোসর তৃণমূলের অপপ্রচারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে এনে যখন বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা চলছে, তখন দিল্লিতে বা জাতীয় রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদ অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী নেহরুর সর্বদলীয় মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের দায়িত্ব পান। তিনি কাজের নৈপুণ্য দেখালেন এক বছরের মধ্যেই স্বাধীন দেশের প্রথম শিল্পনীতি রচনা করে। ঔপনিবেশিক যুগে কোনো সুষ্ঠ শিল্পনীতি ছিল না। শ্যামাপ্রসাদ সমস্ত শিল্পকে চারভাগে ভাগ করে সেগুলির উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। কিন্তু শিল্পের উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত হতে না হতেই তিনি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের নিরাপত্তা প্রদানে নেহরু-নুন চুক্তির ব্যর্থতায় এবং নেহরুর কাশ্মীর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৫১ সালে তিনি নতুন রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তার আগেই কাশ্মীরে বলবৎ হয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা যার মাধ্যমে শেখ আবদুল্লার কাশ্মীর সরকার বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে থাকে,

যেমন গড়ে ওঠে তার আলাদা সংবিধান, আলাদা পতাকা ও আলাদা প্রধানমন্ত্রী। শ্যামাপ্রসাদ এর প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। তিনি বলেন এক দেশে দুই প্রধান, দুই বিধান ও দুই নিশান চলবে না। স্বাধীন দেশের মানুষের কাশ্মীর প্রদেশে প্রবেশের সময় পারমিট ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিনি সেখানে পারমিট ছাড়া প্রবেশ করে শেখ আবদুল্লার পুলিশ দ্বারা গ্রেপ্তার হন। তাকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটি ঘরে রাখা হয় ও ভুল ইনজেকশন প্রয়োগে হত্যা করা হয়। এটি নেহরুর নির্দেশে এক পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যা যার না হয়েছে কোনো পোস্ট মর্টেম, না হয়েছে কোনো সরকারি স্তরে অনুসন্ধান। এক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের মায়ের কান্নাভেজা চিঠিরও কোনো গুরুত্ব নেহরু দেননি। ঠিক যেমন রাশিয়াতে ১৯৬৫-র পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধজয় পরবর্তী শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে গিয়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুরও কোনো সরকারি স্তরে তদন্ত বা মৃতদেহের ময়না তদন্ত ইন্দিরা গান্ধী করেননি তাঁর স্ত্রীর শত অনুরোধেও।

শ্যামাপ্রসাদের বঙ্গ বিভাগ ও বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নামক নিরাপদ হোমল্যান্ড তৈরির বিষয়টি দেশভাগ পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা মানুষের মন থেকে সরিয়ে দেয় এই বলে যে শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গভাগ করেছিলেন বলেই নাকি হিন্দুদের বাড়িঘর, সম্পত্তি ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হয়েছে। সেখানে মুসলমানদের হাতে তাদের নিগ্রহের কথাটি তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এসেছে। হিন্দু উদ্বাস্তুরাও শ্যামাপ্রসাদকে কীভাবে ভুলে গেলেন সেটাও চরম বিস্ময়ের! কিন্তু ইতিহাস তো থেমে থাকে না। কালের চাকা ঘুরতেই থাকে এবং সত্যকে চিরদিন চেপে রাখাও যায় না। ১৯৮০ সালে শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘই ভারতীয় জনতা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠার ৪৬ বছর পর সেই দল পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েছে এবং স্বভাবতই উপযুক্ত মর্যাদায় ২১ জুন তারিখে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই আমরা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে আসছি।

আজ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে চারিদিকে আলাপ আলোচনা চলছে, চলছে তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন এবং সবটাই চলছে এক অনুকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে। কিন্তু আজ থেকে ৩৪ বছর আগে ১৯৯২ সালে এই বাতাবরণ ছিল না, বরং ছিল এক ভীতিজনক ও হিংস্র রাজনৈতিক পরিবেশ। পশ্চিমবঙ্গে তখন কমিউনিস্ট শাসিত বামপন্থী সরকার যারা কথায় কথায় মানুষ খুন করতো। লালকৃষ্ণ আদবানীর দেশব্যাপী রামরথ যাত্রা বিহারের সমস্তিপুরে ১৯৯০ সালের অক্টোবরের ২৩ তারিখে লালুপ্রসাদ যাদব আটকে দিয়ে ও আদবানীকে গ্রেপ্তার করে দেশব্যাপী উত্তেজনা তৈরি করেছিলেন। এর ফলে বিজেপি কেন্দ্রের বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সেই সরকারের পতন ঘটে। অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণ আন্দোলন নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছিল যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর করসেবকরা ওই কলঙ্কচিহ্ন অপসারণ করে এবং যার পরিণতিতে শুধু উত্তরপ্রদেশ সরকার নয়, বিজেপি শাসিত আরও তিনটি রাজ্যের, যথা মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশের নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের নরসিমা রাও সরকার ভেঙে দেয় যা দেশজুড়ে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে।

দেশজুড়ে তৈরি হয় দাঙ্গা পরিস্থিতি। দেশ ও রাজ্য জোড়া এই রকম উত্তেজক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্বক্ষণে ১৯৯২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরে গড়ে ওঠে শ্যামাপ্রসাদ সমতা মঞ্চ। প্রতিষ্ঠা করেন শেখর সিংহ, সঙ্গে ছিলেন রামপুরহাট শহরে বিজেপি দলের প্রতিষ্ঠাতা নবনীতলাল ব্যাস। তখন বিজেপি বলতে ছিলেন ৬ জন নির্ভীক মানুষ যাঁরা বাম আমলের ভয়াবহ হিংস্র পরিবেশে মিছিল, মিটিং সবই করতেন। প্রথমে ৭ জনের কমিটি গড়ে শ্যামাপ্রসাদ সমতা মঞ্চের কাজ শুরু হয়। গঠন থেকে আজ পর্যন্ত শেখর সিংহ ওই মঞ্চের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এই মঞ্চের মূল কাজ হলো নাগরিক অধিকার সংগঠন ও জাতীয় সংহতি রক্ষা। এই মঞ্চ প্রতি বছর পালন করে শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন, সঙ্গে অটলজীর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন এবং আদবানীজীর জন্মদিন। এই মঞ্চ কয়েকটি দাবিদাওয়া নিয়ে আজও কাজ করে চলেছে এবং এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে বীরভূম জেলা রাজ্য রায়ত সঙ্ঘ, বীরভূম জেলা গ্রামীণ শ্রমিক সঙ্ঘ, অটল-আদবানী ভারত সঙ্ঘ প্রভৃতি। এদের দাবিদাওয়ার মধ্যে আছে— (১) দেশের প্রতি স্কুলে ভারতকেশরী ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতি এবং তাঁর কাশ্মীর সত্যাগ্রহের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সৃষ্টির জন্য তাঁর সংগ্রাম স্কুল পাঠ্য তালিকায় রাখতে হবে। (২) রাজ্যের প্রতিটি সরকারি চাকুরীবিহীন পরিবারগুলিতে অন্তত ১ জনকে সরকারি চাকুরি প্রদান করতে হবে। সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদের নির্দেশ পালন ও প্রস্তাবনার সম্মান রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। (৩) প্রধান কৃষি পণ্যগুলির সংগ্রহ মূল্য প্রদান আইন গ্রাহ্য ও ক্ষতিপূরণ যোগ্য করতে হবে। (৪) ব্যবসায়ী ও দোকানজীবীদের জন্য রাজ্য সম্মান ঘোষণা করতে হবে। তাদের সরকারি মর্যাদা দানের জন্য ট্রেড লাইসেন্স ভিত্তিক হেলথ কার্ড দিতে হবে। (৫) পুরাতন টেরিটোরিয়াল আর্মির আধুনিক যুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন ও দেশের প্রতি পরিবার থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে প্রতিরক্ষা বিভাগকে সীমান্ত ও অভ্যন্তরে শক্তিশালী করতে হবে। (৬) বৃহৎ-মাঝারি-ক্ষুদ্র যে কোনো নির্মাণ কার্যে (সরকারি/ বেসরকারি) এই জব কার্ড হোল্ডারদের কাজ দিতে হবে। (৭) পৌরসভা পঞ্চায়েতগুলিতে আশ্রয়হীন নাগরিকদের জন্য সাময়িক আশ্রয় বা কমিউনিটি হাউস নির্মাণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

এইসব দাবিদাওয়া নিয়ে রামপুরহাট শহরের এক কোণে শ্যামাপ্রসাদ সমতা মঞ্চ দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে কাজ করে চলেছে, নীরবে, নিরলস ভাবে। সঙ্গে রয়েছে কৃষক ও শ্রমিকদের দুটি জেলা ভিত্তিক সংগঠন। আজ অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশে এরা সফল হোক, এদের দাবিদাওয়া পূরণ হোক এটাই সকলের ইচ্ছা।

পশ্চিমবঙ্গে এনকাউন্টার

অপরাধীদের কাছে শুভ সংকেত নয়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

বারুইপুরের সূর্যপুরে এক নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে ঘটনাস্থলে পুনর্নির্মাণ করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সিটের সদস্যরা। পুলিশের দাবি অনুযায়ী— প্রভাস এক পুলিশকর্মীর হাত থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশের উদ্দেশে এক রাউন্ড গুলি চালায় এবং পুকুরপাড়ের জলাজঙ্গল টপকে গভীর জঙ্গলের দিকে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তখন তাকে লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি চালায়। তাতে গুরুতর জখম অবস্থায় অপরাধীকে বারুইপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রভাসকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজ্যে শাসন ক্ষমতার পালাবদলের পর গণধর্ষণ সংক্রান্ত মামলায় এটিই প্রথম পুলিশি এনকাউন্টার। এই ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন সমাজমাধ্যমে গত কয়েকদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ চলছিল। অভিযোগ ছিল— বড়ো বড়ো হুঙ্কার সত্ত্বেও প্রশাসনিক পদক্ষেপে ঢিলেমি রয়েছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন-পূর্ব মন্তব্য— 'সকালে জমা নেব, বিকালে খরচ করে দেব' নিয়েও সমালোচনা হচ্ছিল। সে হিসেবে এই এনকাউন্টারকে প্রশাসনের কড়া অবস্থানের ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে বারুইপুরের খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কবির মোল্লা নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে বারুইপুর জেলা পুলিশ। প্রথমে অভিযুক্ত হিসেবে প্রভাস মণ্ডল, দিবাকর মণ্ডল ও আনন্দ সর্দারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কবিরের গ্রেপ্তারির পর এই মামলায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো চারজন। যার মধ্যে প্রভাস মণ্ডল পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে।

নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যার মতো এই নির্মম ঘটনার কারণে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার অভিযোগ উঠেছে এলাকার একশ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে। জানা গেছে তারা রেল লাইনে ভারী লোহার বিম ফেলে রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো, পুলিশের উপর হামলা, অগ্নি সংযোগ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকার জন্য পুলিশ এপর্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়া সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভিডিয়ো ক্লিপ খতিয়ে দেখে বাকি হামলাকারীদের চিহ্নিত করার কাজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকা নির্যাতন ও হত্যার ঘটনায় তদন্ত যেমন গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে চালানো হচ্ছে, ঠিক তেমনি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনাতেও কাউকে রেয়াত করা হবে না।

অন্যদিকে এনকাউন্টারের পর প্রভাস মণ্ডলের মা বলেছেন, 'যা হয়েছে, ঠিক হয়েছে।' আবার প্রভাসের স্ত্রী বলেছেন— 'ও বরাবরই নোংরা মানুষ ছিল। ও এই কাজ করেনি এমন দাবি করতে পারব না। বিয়ের পর আমার ওপরও অত্যাচার করেছে। দোষ করেছে, তাই গুলি খেয়েছে।' অথচ ধর্ষক প্রভাসের জন্য চোখের জল ফেলে বামপন্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন— 'প্রভাস একজন ভদ্রলোক।'

> **বারুইপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্য তোলপাড় হলেও মালদহের ইংরেজবাজার থানা এলাকায় ১২ বছর বয়সি ষষ্ঠ শ্রেণীর স্কুলছাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রতিবেশী যুবক শেখ রবিউলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলেও তা নিয়ে বামেদের বা তৃণমূলের প্রতিবাদ বা মোমবাতি মিছিল দেখা যাচ্ছে না।**

মৃতা নাবালিকার বাবা বলেছেন— 'মুখ্যমন্ত্রী আমার দাদা, আমার পুরো ভরসা আছে। দাদার কাজে আমি খুশি। পুলিশ খুব ভালো কাজ করছে। দাদা আমাকে কথা দিয়েছিলেন, দোষীরা কেউ ছাড় পাবে না। দাদার উপর আমার পুরো ভরসা আছে। আমার মেয়ে বিচার পাবে। আমার বিশ্বাস যে, দাদা কথা রাখবেন।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন— 'পুলিশ কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালিয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ প্রশাসনের ব্যাপার। তবে একটা বার্তা গিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে অপরাধীরা আর পার পাবে না। অপরাধীদের কোনো ধর্ম হয় না, কোনো জাত হয় না। সেটা আগের সরকার ভুলে গিয়েছিল; আমি আবার

বলছি সরকারের সমস্ত বিষয়ে দল হস্তক্ষেপ করবে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই বিষয়ে যা বলার তিনি বলবেন। তবে এই ধরনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুশি। আর সেই কারণেই তো তৃণমূল কংগ্রেসকে বিসর্জন দিয়ে বিজেপিকে নিয়ে এসেছেন মানুষ।'

নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর এলাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এক শ্রেণীর জনতা বারুইপুর-জয়নগর রাস্তা অবরোধ করে। পুলিশের গাড়ি, ভাঙচুর করে এবং রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই উত্তেজনার মধ্যে সন্দেহের বশে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়, যার সঙ্গে পরবর্তী তদন্তে মূল ঘটনার কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। গণপিটুনির ঘটনায় পুলিশ এপর্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারুইপুর গিয়ে মৃতার এবং ইন্দ্রজিতের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন যে, দুটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের কঠোর শাস্তি হবে বলে। তিনি আরও বলেছেন, পুলিশের গাড়ি ভাঙা হয়েছে, রেললাইনের ক্ষতি করা হয়েছে। ২০০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হবে। যারা উসকানি দিয়েছে তাদেরও চিহ্নিত করা হয়েছে। ওদেরও শিক্ষা দেবে সরকার।

বিগত উনপঞ্চাশ বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নারী, নাবালিকা, শিশু যত ধর্ষিতা ও নিহত হয়েছে তার জন্য কমরেড বা তৃণমূলিদের কোনো আন্দোলন তো দূরের কথা বরং ধর্ষিতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ মন্তব্য করেছেন তাঁরা। যেমন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন— ওরকম তো কতই হয়।' আর সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে ধর্ষণ নিয়ে ২০১২ সালে পার্কস্ট্রিটকাণ্ডে বলেছিলেন— 'মেয়েটির চরিত্রের দোষ। দর কষাকষি নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে বচসা হয়েছিল।' ২০১৩ সালে কামদুনি নিয়ে— 'শরীর থাকলে যেমন জ্বর-জ্বালা হয়, তেমনি একটু আধটু রেপও হয়।' ২০১৪ সালে সিউড়ি নিয়ে— 'বাচ্চা ছেলেরা একটু আধটু দুষ্টমি করবে না?' ২০১৫ সালে কাকদ্বীপ নিয়ে— 'পুরো রেপ হলে ৪০ হাজার, হাফ রেপ হলে ১৫ হাজার।' ২০১৫ সালে কাটোয়া নিয়ে--- 'ছোট্ট একটা সাজানো ঘটনা।' ওই একই সালে রাণাঘাটে— 'সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে।' ২০২২ সালে হাঁসখালি— 'লাভ অ্যাফেয়ার্স ছিল, মেয়েটি প্রেগন্যান্ট ছিল।' ২০২৪ সালে আরজি কর— 'রেপ হলেও বাড়ির লোককে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে দেব।'

সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতা হারিয়ে বারুইপুর কাণ্ডে মোমবাতি নিয়ে যখন রাস্তায় নামেন তখন সাধারণ মানুষ যদি বলেই বসে— 'ডাইনির চোখে আবার জল?' তখন কি তাদের দোষ দেওয়া যায়?

বারুইপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্য তোলপাড় হলেও মালদহের ইংরেজবাজার থানা এলাকায় ১২ বছর বয়সি ষষ্ঠ শ্রেণীর স্কুলছাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রতিবেশী যুবক শেখ রবিউলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলেও তা নিয়ে বামেদের বা তৃণমূলের কারও প্রতিবাদ বা মোমবাতি মিছিল দেখা যাচ্ছে না। অসুস্থ অবস্থায় মেয়েটিকে তার পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে নির্যাতিতার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। বারুইপুর কাণ্ডে আরএসএস ও বিজেপিকে জড়িয়ে বামেরা রাজনীতি করতে ব্যস্ত, কারণ ধর্ষক প্রভাস জাতিতে হিন্দু, আর মালদহকাণ্ডে জড়িত ধর্ষক শেখ রবিউল যেহেতু মুসলমান, সেকারণে বামেদের প্রতিবাদ নেই, আর মমতা ব্যানার্জির নেই কোনো মোমবাতি মিছিল।

একটি খবরে আরও জানা গিয়েছে— বারুইপুরকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার একজন সিপিএম কর্মী। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের হয়ে বুথ এজেন্ট ছিল। বারুইপুর কাণ্ডে বামপন্থীরা ধর্ষিতা নাবালিকার জন্য পথে নামেনি। এরা ধর্ষকদের আড়াল করতেই আরএসএস এবং বিজেপির নামে মিথ্যাচার করেছিল। ওরা অরাজকতা সৃষ্টি করে সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের বদনাম করতে সাম্প্রদায়িক হিংসার ছক কষেছিল। ওদের তথাকথিত বিপ্লব ও মানবিকতা আপাতত শীতঘুমে চলে গেছে। এখন ওরা মুখ লুকোবে। অপেক্ষায় থাকবে নতুন কোনো মৃতদেহের জন্য। তখন আবার কবিতা লিখবে, গান গাইবে, চোখের জল ফেলবে।

সিপিএম, তৃণমূল যা করছে তাতে তাদের শেষের দিন আরও ঘনিয়ে আসবে। প্রভাস পুলিশের গুলিতে পরপারে পৌঁছে গেছে। এখনকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাত থেকে ইন্দ্রজিতের হত্যাকারীরা যেমন রেহাই পাবে না, তেমনি মালদহের নাবালিকা ধর্ষক শেখ রবিউলও রেহাই পাবে না। আরও রেহাই পাবে না রেললাইনের ক্ষতিকারী, পুলিশের ওপর হামলাকারী, অগ্নিসংযোগেরত, কেউ-বা এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী, এবং তাদের উসকানিদাতা মাতব্বররাও। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারা যেন শুধু মনে রাখে— পশ্চিমবঙ্গে এনকাউন্টার— অপরাধী এবং তাদের মদতদাতাদের কাছে শুভ লক্ষণ নয়।

With Best Compliments From -

A
Well Wisher

নবম ও দশম শ্রেণীর ইতিহাস সিলেবাস অনতিবিলম্বে পরিবর্তন করা প্রয়োজন

ডঃ তরুণ মজুমদার

যুবসমাজের মনস্তাত্ত্বিক ভিত তৈরি হওয়ার সন্ধিক্ষণে যদি মানব সভ্যতার প্রকৃত শত্রুদের তারা চিনতে না শেখে তাহলে সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শিক্ষা ব্যবস্থার 'ম্যান মেকিং মিশন'টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অবিদ্যার উপাসনা যেমন তমিস্রাকে বরণ করে নিতে শেখায়, তেমনি ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে একশ্রেণীর বিকিয়ে যাওয়া ইতিহাসবিদের কীট দংশিত ইতিহাস পড়ে এই উপমহাদেশের যুব সমাজ বস্তুকেন্দ্রিক বিকৃত সাম্যবাদ ও ভোগবাদের অনুরাগী হয়ে ভুল পথে চালিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকেই ইতিহাস চর্চা-সহ উচ্চশিক্ষা পুরোটাই বামেদের কুক্ষিগত হওয়ার ফলে ছাত্র-যুব মনন আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড়ো মাপের গণহত্যাকারী বলতে শুধু অ্যাডল্ফ হিটলারকেই জানে এবং বোঝে।

দেশের উচ্চশিক্ষায় জাঁকিয়ে বসে থাকা বিকৃত বাম ইকোসিস্টেম অত্যন্ত সুচতুরভাবে কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিতে প্রশাসনিক মদতে চলা পৈশাচিক গণহত্যাগুলি সম্পর্কে হয় নীরব নয়তো 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রোপাগান্ডা' বলে দাগিয়ে দিতে ব্যস্ত। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যারা ইতিহাস পড়েছেন বলুন তো পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, রোমানিয়া, উত্তর কোরিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে কমিউনিস্ট শাসক দ্বারা সংঘটিত বীভৎস গণহত্যাগুলি সম্পর্কে স্কুল পাঠ্যে পড়েছেন কি না? না, পড়েননি। ঠিক এখানেই এদেশের শিক্ষা ও বৌদ্ধিক জগতে রাজত্ব করা বাম-জেহাদি ইকোসিস্টেমের সার্থকতা আর ভারতীয় জনসাধারণকে সঠিক ইতিহাসের আলোকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই জাতীয়তাবাদী শক্তির সাময়িক ব্যর্থতা।

জেহাদি-বাম ইকোসিস্টেমকে বন্দুকের নল দিয়ে থামানোর চেষ্টা করলে ক্ষণিকের জন্য সাময়িক সাফল্য এলেও তা কখনোই চিরস্থায়ী হবে না। এদের শিকড়সমেত উৎখাত করার এক এবং একমাত্র রাস্তা হলো শিক্ষাক্ষেত্রে বৌদ্ধিক জাতীয়তাবাদী ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা। রাতারাতি এই বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলা এক অলীক কল্পনা। প্রয়োজন অন্তত দশ বছরের দীর্ঘমেয়াদি সুচিন্তিত সর্বাত্মক পরিকল্পনা যার অঙ্গ হিসেবে প্রথমেই স্কুল পাঠ্য থেকে বিকৃত ইতিহাসের আবর্জনা মুছে ফেলা যাতে নিজের সুপ্রাচীন ঋদ্ধ ঐতিহ্যের বিষয়ে ছাত্র মননে আরও বেশি জানার আগ্রহ তীব্রতর হয়ে উঠে। দ্বিতীয় ধাপে ক্লাস নাইন এবং ক্লাস টেনের ইতিহাস বইয়ে বিশ্বজুড়ে শ্রেণীশত্রুতার নামে বামপন্থীদের হাতে যে জান্তব জিঘাংসা চলেছে, তার বিস্তৃত বিবরণকে স্থান দেওয়া যাতে বাঙ্গালি ছাত্র মনন মেকি বিপ্লবের রোমান্টিসিজম থেকে স্ব-ইচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর্টস ফ্যাকাল্টিতে বামপন্থা-চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মূল কাঁচামালের জোগানে ঘাটতি শুরু হয়।

এছাড়া যদিও সরকার পরিবর্তিত হয়েছে তথাপি এখনো রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাউন্সিলে সিস্টেম পরিবর্তিত হয়নি, কারণ অধিকাংশ উপাচার্য, অধ্যক্ষ ও কাউন্সিলের আধিকারিকরা ঠেলায় পড়ে রং পরিবর্তন করেছেন ঠিকই, তবে এক্ষেত্রে শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের প্রবাদতুল্য বাক্যটি স্মরণ রাখা খুবই প্রাসঙ্গিক—

'বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না।' আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো— সাহিত্য, শিল্পকলা, সিনেমা ও নাটক, কারণ এগুলো সমাজ ও জনমানসে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। যে সকল শিল্পী ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বিগত সরকারের সমস্ত পাপকে গৃহপালিত পশুর মত সমর্থন করে গেছেন তাদের চিহ্নিত করে সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বাদ দেওয়া এবং তাদের যাতে নতুন কোনো দায়িত্ব না দেওয়া হয়, তা সুনিশ্চিত করা। এর অন্যথা হলেই ভবিষ্যতে এরাই আবার 'তথাকথিত সাম্যবাদী' শিল্প-সাহিত্য রচনা করে জনগণের কোমর পুনরায় ভাঙতে থাকবেন।

ছাত্রসমাজের সামাজিক মনন গড়ে ওঠার সন্ধিক্ষণে তাদের থেকে নিজেদের দেউলিয়া রাজনৈতিক দর্শনের পাপ সন্তর্পণে আড়াল করে মেকি শ্রেণীশত্রুতার বিষাক্ত বিষবাষ্পে ছাত্র মননকে জারিত করার যে নির্লজ্জ প্রয়াস বাম-জেহাদি ইকোসিস্টেম বিগত দশকগুলি ধরে করে চলেছে, তা আর চলতে দেওয়া চলে না। দেশের ছাত্রসমাজ পল পট, মাও-সে-তুং, নিকোলে চেসেস্কু, জোসেফ স্তালিন, জোসেফ টিটো, কিম জং-উন নামক মানবতার শত্রুদের চিনুক। জানুক কোন মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে এই সব নরপিশাচরা পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। সময় এসেছে এদের বিকৃতির কদর্যতা যা বারেবারে মানব সভ্যতাকে কলঙ্কিত করেছে, তা ছাত্রসমাজের সামনে তুলে ধরার; ঠিক সে-সময় যখন তাদের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ভিত গড়ে উঠছে।

এভাবেই জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধিক শক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় হোক আর দেশ তথা সমাজ বাম ও জেহাদি শক্তি মুক্ত হয়ে পুনরায় গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে প্রবেশ করুক। 'ইন্ডিয়া'কে প্রকৃত অর্থে 'ভারত'-এ রূপান্তরিত করার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হোক। দেশমাতৃকা পুনরায় জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুন। ▯

বালুচিস্তান ও ১৯৭১-এর প্রতিধ্বনি

দক্ষিণ এশিয়া কি আরেকটি ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে?

১৯৭১ আমাদের শিখিয়েছিল, দেশের মানচিত্র শুধু যুদ্ধ দিয়ে নয়, রাজনৈতিক বৈধতা, কূটনৈতিক সমর্থন এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার সমন্বয়ে পরিবর্তিত হয়। বালুচিস্তান সেই পথে এগোচ্ছে কি না, তার উত্তর ভবিষ্যৎই দেবে।

অরিত্র ঘোষ দস্তিদার

বালুচিস্তানের একটি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে 'রিপাবলিক অব বালুচিস্তান' ঘোষণার দাবি, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, নিজস্ব মুদ্রা প্রবর্তন এবং রাজ্যের অধিকাংশ অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ঘোষণার পর দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত পরিসরে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে অনেকেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা টানছেন। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করতে হলে আবেগ নয়, প্রয়োজন নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ।

১৯৭১ সালে ইতিহাসের শিক্ষাটি হলো--- বাংলাদেশের জন্ম ছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, ভাষাগত বঞ্চনা এবং সামরিক দমনের পরিণতি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামি লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর অপারেশন সার্চলাইট পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক দমন-পীড়নের সূচনা করে, যা মুক্তিযুদ্ধে রূপ দেয়। প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেওয়ায় পরিস্থিতি মানবিক সংকটে পরিণত হয়। দীর্ঘ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর ভারত ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মাত্র তেরো দিনের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে বাস্তব রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে।

১৯৪৭ সাল থেকেই বালুচিস্তানে স্বাধীনতার আন্দোলন বিদ্যমান। বালুচ জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির অভিযোগ— পাকিস্তানের রাজনৈতিক উপেক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বণ্টন, জোরপূর্বক নিখোঁজ এবং সামরিক অভিযান চলছে।

সাম্প্রতিক ঘোষণায় দাবি করা হয়েছে যে বালুচিস্তানের অধিকাংশ ভূখণ্ড, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবং জ্বালানি ক্ষেত্র তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এই দাবিগুলির স্বাধীন বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যাচাই এখনো হয়নি। ফলে রাজনৈতিক ঘোষণাকে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা হিসেবে গণ্য করা সমীচীন নয়।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মতোই বালুচিস্তানের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বঞ্চনা, সম্পদের প্রশ্ন, সামরিক অভিযানের অভিযোগ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে আন্দোলনের মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এই কারণেই দুই ঘটনার মধ্যে তুলনা স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে। তবে মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে ছিল একটি সুস্পষ্ট গণতান্ত্রিক জনাদেশ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংকট। অন্যদিকে বালুচিস্তানের ক্ষেত্রে এখনো কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই, স্বাধীন সরকারের কার্যকর অস্তিত্বও প্রতিষ্ঠিত নয়। এছাড়া ১৯৭১ সালে ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ ছিল একটি নির্ণায়ক উপাদান, যার কোনো সমান্তরাল পরিস্থিতি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না।

ভারতের কাছে বালুচিস্তান শুধুমাত্র পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। আরব সাগরের উপকূল, গোওয়াদর বন্দর, চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর, খনিজ সম্পদ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার কারণে এই অঞ্চল কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বালুচিস্তানের যে কোনো বড়ো পরিবর্তন ভারতের নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও ভূ-রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বর্তমান বালুচিস্তানের পরিস্থিতির মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক সাদৃশ্য থাকলেও দুই ঘটনাকে এক করে দেখা যাবে না। দেশ গঠনের জন্য কেবল স্বাধীনতার ঘোষণা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন কার্যকর প্রশাসন, ভূখণ্ডের বাস্তব নিয়ন্ত্রণ, জনগণের বৈধ সমর্থন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

অতএব বালুচিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিকে আবেগের পরিবর্তে ইতিহাস, আন্তর্জাতিক আইন এবং ভূ-রাজনীতির আলোকে বিচার করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ১৯৭১ আমাদের শিখিয়েছিল যে দেশের মানচিত্র শুধু যুদ্ধ দিয়ে নয়, রাজনৈতিক বৈধতা, কূটনৈতিক সমর্থন এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার সমন্বয়ে পরিবর্তিত হয়। বালুচিস্তান সেই পথে এগোচ্ছে কি না, তার উত্তর ভবিষ্যৎই দেবে। □

পাকিস্তান ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে

আগে পশ্চিমি দেশগুলো এসব বুঝতে পারত না। তাছাড়া রাশিয়া, চীন ও আমেরিকার পারস্পরিক শত্রুতার সুযোগও পাকিস্তান যতটা সম্ভব নিয়েছে। পাড়ায় ঝামেলা হলে যেমন গুন্ডারা কোনো এক পক্ষ নিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করার চেষ্টা করে, পাকিস্তানও একইভাবে কাজ করে। পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ওআইসি দেশগুলোর কাছে নিজের বড়ো ভাই হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে এবং সবাইকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন সুবিধা নিয়েছে। বাংলাদেশও একই নীতি অনুসরণ করে। ১৯৭১ সালে ভারতে আশ্রয় নেওয়া পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব ভারতই নিয়েছিল; রাষ্ট্রসঙ্ঘ নয়। আসলে মাফিয়া বসরা যেমন সাধারণ মানুষকে লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনে এনে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে, একইভাবে পাকিস্তান আফগানদের জঙ্গি বানিয়ে পশ্চিমি দেশগুলো থেকে অর্থ আদায় করেছে। আফগানিস্তানের পর পাকিস্তানের নতুন টার্গেট বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ যদি ভারতের সঙ্গে লেন-দেন ও শান্তিচুক্তি করত, তাহলে দুই দেশই উপকৃত হতো। পাকিস্তানের অবস্থান ভারতের বিরুদ্ধে, এখন বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের বিরুদ্ধে। তারা স্বপ্ন দেখে, চীনকে নিয়ে যুদ্ধ করে ভারত দখল করবে। ব্যবসায়ী চীন কখনো ভারত দখল করবে না, দখল দখল হুমকি চলবে। অথচ ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ করলেও পাকিস্তান সব মুসলমানকে আশ্রয় দেয়নি। ভারত সিএএ-এর মাধ্যমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কিছু সংখ্যালঘুকে বৈধতার সুযোগ দিয়েছে। এবার বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যদি একই নীতি নিয়ে দেশভাগের নিয়মগুলিকে ১০০ শতাংশ কার্যকর করে, তাহলে এই তিন দেশের মধ্যে ঝগড়া ও যুদ্ধ থাকবে না। গাজির নাতি ভণ্ড নেহরু ভারতের অনেক ক্ষতি করেছে।

পাকিস্তানের মতোই বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতি ভারতীয়দের আরও সতর্ক করেছে। ভারতীয় মুসলমানরাও কোনো দিন পাকিস্তান বা বাংলাদেশে যেতে চায় না। উলটে তারা পাকিস্তানি ও বাংলাদেশিরা ভারতে আসতে চায়। বাংলাদেশের এক মৃত জেনারেলের স্ত্রী তাঁর সন্তানদের দার্জিলিঙে পড়ান। একজন বাংলাদেশি সাংবাদিকের মাধ্যমে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁদের জন্য ভারতীয় কাগজপত্রের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন। আমার সে ক্ষমতা না থাকায় পরে আর যোগাযোগ করেননি। ইরানের পর পাকিস্তানের পালা। তারপর লাইনে থাকবে বাংলাদেশ। ইরান হয়তো আবার পশ্চিমিদের বন্ধু হতে পারে, কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কি কখনো পশ্চিমিদের বন্ধু হবে? পাকিস্তান আগামী ১৫ বছরের মধ্যে ৩ ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না।

—**মৃণাল মজুমদার,**
বার্লিন, জার্মানি।

বঙ্গের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে : শিকড়ে ফেরার আহ্বান

একদিন 'বঙ্গ' নামটি উচ্চারিত হলেই বিশ্বের দরবারে ভেসে উঠত এক গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। এই ভূখণ্ড ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, স্বামী বিবেকানন্দের, শ্রীঅরবিন্দের, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের। এছাড়া আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যজিৎ রায়, ক্ষুদিরাম বসু, বাঘা যতীন, মাস্টারদা সূর্য সেন এবং অসংখ্য মনীষী, বিপ্লবী ও চিন্তানায়কের কর্মভূমি। বঙ্গ ছিল চিন্তার, সাহসের, সংস্কৃতির ও আত্মমর্যাদার ভূমি। এখন সেই বঙ্গকে ঘিরে এক গভীর আত্মসমালোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাসচর্চা এবং নাগরিক দায়িত্ব— এই চার স্তম্ভের উপর যে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক পরিচয় নির্মিত হয়েছিল, তা নতুন করে শক্তিশালী করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, জনপরিসরে মনীষীদের আদর্শ ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা কমেছে; তার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক বিতর্ক ও দৈনন্দিন সমস্যাই অধিক প্রাধান্য পাচ্ছে। এই পরিবর্তন নিয়ে মতভেদ থাকলেও আত্মপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। এই পরিবর্তন নিয়ে মতভেদ থাকলেও আত্মপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার একটি গণতান্ত্রিক সমাজে অবশ্যই আছে।

বঙ্গের ইতিহাস শুধু অতীতের গৌরবগাথা নয়, ভবিষ্যতের দিশারিও। যে জাতি নিজের ইতিহাস ভুলে যায়, সে জাতি নিজের পরিচয়ও বিস্মৃত হয়। তাই ইতিহাসকে রাজনৈতিক সুবিধা বা অসুবিধার মাপকাঠিতে নয়, গবেষণা, দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত। প্রকৃত ইতিহাস সামনে আসুক, নতুন প্রজন্ম সত্য জানুক, প্রশ্ন করুক এবং গবেষণার মনোভাব গড়ে তুলুক— এটাই হওয়া উচিত সকলের প্রত্যাশা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন; তিনি আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা ও অদম্য দেশপ্রেমের প্রতীক। তাঁর অন্তর্ধান নিয়ে বহু প্রশ্ন আজও আলোচনার বিষয়। সেই কারণেই বহু মানুষ মনে করেন, সংশ্লিষ্ট নথি ও তথ্য যতদূর সম্ভব জনসমক্ষে আনা উচিত, যাতে গবেষক ও ইতিহাসবিদেরা আরও সুস্পষ্ট মূল্যায়ন করতে পারেন। ইতিহাস কখনো প্রশ্নকে ভয় পায় না।

বঙ্গের পুনর্জাগরণ কোনো একক ব্যক্তি বা একক রাজনৈতিক দলের হাতে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সৎ নেতৃত্ব, উন্নত শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক মনন, সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস এবং সচেতন নাগরিক সমাজ। যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক, তার ভালো কাজকে সমর্থন করা এবং ত্রুটি থাকলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

ফঃ ৩

সমালোচনা করা— এটাই একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য।

আজও পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অসংখ্য সৎ, সাহসী, কর্মঠ ও দেশপ্রেমিক মানুষ আছেন। তাঁদের হাত ধরেই পশ্চিমবঙ্গ আবার জ্ঞান, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও মানবিকতার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। বঙ্গভূমির আত্মা আজও জীবিত; প্রয়োজন তাকে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলা।

আসুন, আমরা বিভাজনের রাজনীতি নয়, আত্মমর্যাদার রাজনীতি করি; বিদ্বেষ নয়, সত্যভিত্তিক ইতিহাসচর্চাকে উৎসাহ দিই; উদাসীনতা নয়, সচেতন নাগরিকত্বকে শক্তিশালী করি। কারণ পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমাদেরই চিন্তা, চরিত্র ও কর্মের উপর। পশ্চিমবঙ্গ আমার মাথা তুলে দাঁড়াক— এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

—**শুভাশীষ পাইন,**
পুয়াবাগান, বাঁকুড়া।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে একটি প্রশ্ন

আপনি দলবল নিয়ে বারুইপুর ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে মিছিল বের করতে পেরেছেন। অবশ্যই আদালতের অনুমতি নিয়ে, সাহস সঞ্চয় করে। একবার মনে করুন, ২০২১ সালে বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়ে কী অপরাধ করেছিল? আপনার দল তৃণমূল ২ মে ২০২১ সালে কী আচরণ করেছিল? বিজেপির ২০০ বেশি কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল। মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিজেপি মহিলা কর্মীদের ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি হরণ করা হয়েছিল। বুলডোজার দিয়ে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের বাড়িঘর, দোকান ভাঙা হয়েছিল। লেলিহান আগুনে দমকল আসতে দেওয়া হয়নি। হয়নি কোনো থানা, পুলিশ সুপারের এবং জেলা শাসকের কার্যালয়ে সর্বদলীয় শান্তি সভা। আজ কি বলবেন কে বা কোন নেতার নির্দেশে এই কাজ হয়েছিল? জানি, সেকথা বলার মতো সৎ সাহস আপনার নেই। আপনার চাটুকাররা আপনাকে বাঘের (মহিলা) সঙ্গে তুলনা করলেও আপনি একজন অসৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এক কথায় কাগুজে বাঘ। যার জন্য আপনার নিজের ও দলের পরাজয় স্বীকার করতে ২ মাস সময় লাগলো। এবার খোলা মনে চিন্তা করে বলুন ২০২১ ও ২০২৬-এর নির্বাচনের কী কী ব্যতিক্রম? জানি, আপনার সত্যি কথা বলার অভ্যাস একেবারেই নেই। তাই আমি বলে দিচ্ছি।

এবার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত থানায় শান্তিরক্ষার জন্য সর্বদলীয় সভা হয়েছে। এই শান্তি মিটিঙে তৃণমূলের কেউ মাথায় ব্যান্ডেজ করে বা হাত পায়ে প্লাস্টার করে আসেনি। ২০২১ সালে এই ধরনের শান্তি মিটিং হলে বিজেপির নেতা-কর্মীদের টুকরো টুকরো করে দিত আপনার সৃষ্ট তৃণমূল বাহিনী। এবার এসব কিছুই হয়নি। যদি আপনার নেতৃত্ব সঠিক হতো তাহলে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরপরই আপনার স্নেহের ভাইপোকে গাড়ির বোনেটের উপর দাঁড়িয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তুই তোকারির জন্য ক্ষমা চাইতে বলতেন।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

মাতৃশক্তির জন্য বিনামূল্যে বাস, বনগাঁর মা-বোনেরা কি বঞ্চিত থাকবেন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাতৃশক্তির জন্য সরকারি বিনামূল্যে যাতায়াতের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে একটি মানবিক, জনমুখী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। নারীর নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যাতায়াত নিশ্চিত করার এই পদক্ষেপকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। তবে এই মহৎ উদ্যোগের বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে সীমান্ত শহর বনগাঁর মানুষের মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন একটাই, সরকারি বাসই যদি না থাকে, তাহলে বিনামূল্যে বাস পরিষেবার সুবিধা ভোগ করবেন কীভাবে বনগাঁ মহকুমার মা-বোনেরা? কলকাতা ও জেলার কয়েকটি বড়ো শহরে সরকারি বাস নিয়মিত চলাচল করলেও বনগাঁ মহকুমায় সরকারি বাস পরিষেবা কার্যত নেই বললেই চলে। বনগাঁ কোনো সাধারণ শহর নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত মহকুমাশহর। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, চাকরি এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রয়োজনে যাতায়াত করেন। অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলে আজও পর্যাপ্ত সরকারি বাস পরিষেবা না থাকা সত্যিই বিস্ময়কর। সবচেয়ে ইতিবাচক বিষয় হলো, সরকারি বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সরকারি জমিরও অভাব নেই। বনগাঁ-যশোর রোডে স্টেট ব্যাংকের উলটোদিকে সরকারি জমি রয়েছে। এছাড়াও কালীতলা পার্কিং নামে পরিচিত সরকারি জায়গাটিকেও সহজেই একটি আধুনিক সরকারি বাসস্ট্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। অর্থাৎ সমস্যার মূল কারণ জমির অভাব নয়; প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং দ্রুত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত।

আজ বনগাঁবাসীর আবেদন কোনো রাজনৈতিক দাবি নয়; এটি একটি ন্যায্য নাগরিকের দাবি। সীমান্ত অঞ্চলের মানুষও এই রাজ্যের সমান অধিকার দাবি করতে পারে। তাই তাঁদের কাছেও সরকারি পরিষেবার সমান সুযোগ পৌঁছে দেওয়া সরকারের নৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব। রাজ্য সরকারের কাছে বিনীত আবেদন, বনগাঁ মহকুমায় অবিলম্বে নিয়মিত সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হোক এবং একটি স্থায়ী ও আধুনিক সরকারি বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের উদ্যোগে গ্রহণ করা হোক। তবেই মাতৃশক্তির জন্য ঘোষিত এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্প প্রকৃত অর্থে সফল হবে। উন্নয়নের প্রকৃত মানদণ্ড শুধু বড়ো শহরের উন্নয়ন নয়; সীমান্তে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বনগাঁবাসীর প্রত্যাশা, সরকারের মানবিক উদ্যোগের আলো এবার সীমান্ত শহর বনগাঁর প্রতিটি মা-বোনের জীবনেও সমানভাবে পৌঁছোবে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজ রোড, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

অন্ধকার থেকে ফিরে আসুক আমাদের মেয়েরা

মৌ চৌধুরী

খবরটা ছোটো করে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও অনেকের মনেই দুঃখের সৃষ্টি করেছে। খড়্গপুরের একটি অতীব নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারজন ছাত্রী ও তিনজন ছাত্র ঘোরতর নেশাগ্রস্ত ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথে বেলল্লাপনার অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা ভেবেই পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বছরখানেক আগে পুলিশ কলকাতার নামি দুটি মেডিক্যাল কলেজের আটজন পড়ুয়াকে ময়দানে গভীর রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়েছিল। এদের ভেতর ছিল ছ'জন ছাত্রী। প্রকাশিত এই খবরেই উল্লেখ করা হয়েছে গত এক বছরে একই ধরনের মোট তেরোটি ঘটনার।

বিষয়টি উদ্বেগজনক এই কারণে যে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছেড়ে দিলেও আইআইটি, মেডিক্যাল কলেজ, আইআইএম, প্রযুক্তি, কারিগরি বা প্রকৌশলী-সহ এই ধরনের উচ্চমানের এলিট হিসেবে পরিচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা ভবিষ্যতে সমাজের ক্রিমি লেয়ারে পৌঁছে যায়। তাদের মেধাশক্তি ও গবেষণাপ্রসূত উদ্ভাবন— দেশ ও সমাজকে পথ দেখায়। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ পড়ুয়াই সাধারণত উচ্চ মেধার। ভাবনার বিষয় যে, তাদের নেশার অভ্যাস তাদের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সমাজের সর্বস্তরের বিপথগামী কিশোরী ও তরুণীদের নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করা এবং সঠিক দিশা দেখানো সর্বভারতীয় এনজিও সংস্থা 'সিধা পথের' রাজ্য কমিটির-সহ সম্পাদক অধ্যাপিকা কাবেরী মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রীদের ভেতর নেশার বিষয়টি নতুন নয়। তবে বিগত চার দশক ধরে ব্যাপকভাবে ছাত্রীদের ভেতর এর প্রবণতা বেড়েছে। গোটা দেশেই এর ছায়া দেখা যাচ্ছে। এখন ভয়াবহ আকার নিয়েছে এই নেশা। মদ গাঁজা ছাড়াও ড্রাগস এবং যথেচ্ছ যৌনাচার তাদের গ্রাস করেছে। মনস্তত্ত্বের অধ্যাপিকা কাবেরী জানিয়েছেন, এইসব এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীমাত্রই নেশায় আক্রান্ত হবেই বা সবাই চূড়ান্ত নেশাগ্রস্ত এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে প্রবণতা কিন্তু অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। গত দুই বছরে এলিট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই রাজ্যের মোট ন'জন ছাত্রী নেশার খপ্পরে পড়ে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তাদের সবাইকেই নয়ডার সরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠাতে হয়েছিল।

কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিশিষ্ট গাইনোকোলজিস্ট শুভ্রা দাস মণ্ডল জানিয়েছেন, কিশোরী ও তরুণীদের ভেতর নেশার প্রবণতা ভয়াবহ সংখ্যায় বেড়েছে। সমাজের সবার কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র এলিট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের কথা যদি ভাবা যায়, তবে দেখা যাবে ভবিষ্যতে তারা তো বিশাল ডিগ্রি নামের সঙ্গে জুড়বে। তারা নিশ্চিতভাবে খুব বড়ো দায়িত্বশীল পদে চাকুরি করবে, অনেক বেতন পাবে, কিন্তু শারীরিক ভাবে নানাদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। নেশায় আসক্তদের প্রথমেই পাচন প্রক্রিয়ায় সমস্যা আসে, গ্যাস অম্বল বদহজমে ভোগে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, অনিয়মিত ঋতুচক্র হতে পারে। ফলে মেজাজ অকারণে চড়া হয়ে পড়া, সন্তান ধারণের সমস্যা, মানসিক দ্বন্দ্ব, হতাশা গ্রাস করতেই পারে।

এর পরিণাম সরাসরি এসে পড়ে ব্যক্তি ও সাংসারিক জীবনে। সুন্দর জীবন উপভোগ করতে না পারার মানসিক যন্ত্রণা এসে যায়। ফলে সুন্দর সফল উত্তরাধিকার দেবে কী করে। তবে সুখের কথা, যেমন সব ছাত্রীই নেশা করে না ঠিক তেমনই অনেকেই আবার ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবন উপভোগ করছে।

আইআইটি কানপুর থেকে তথ্য প্রযুক্তিতে এমটেক পাশ করা অনন্যা চক্রবর্তী কৌর জানিয়েছেন, লেখাপড়ার চাপ কমানোর নামে বা অন্যভাবে সহপাঠী ছাত্রদের মাধ্যমে প্রথমে মজা করে অথবা চাপে পড়ে হালকা ড্রাগস নেওয়া শুরু, তারপর ঘোর অন্ধকারে এগিয়ে যাওয়া। অনন্যার কথায়, সাধারণত প্রায় সবাই ড্রাগসের প্রবল প্রতাপ থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসে কিন্তু সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত হতে পারে না। প্রফেশনাল জীবনেও অনেকেই ড্রাগস নিয়ে থাকে।

একজন মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ার, আইআইএম, আইএসআই বা এই ধরনের পড়ুয়ার পেছনে সরকার জনপ্রতি কোটি টাকার ওপর খরচ করে। এই টাকা দেশের মানুষের। দেশের মানুষের প্রতি কি কোনো দায় নেই এই এলিট পড়ুয়াদের? এসব কী ভাবার নয়। দেশের ঋণ তো এই পড়ুয়ারা তাদের মেধা দিয়েই শোধ করবে। আমেরিকার একটি নামি সফটওয়্যার সংস্থার প্রায় শীর্ষস্তরের দায়িত্ব সামলেও অনন্যা নেশা আসক্তদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার ব্রতও গ্রহণ করেছেন। □

নেফ্রোটিক সিনড্রোমে জল

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

কিডনির একটি বড়ো কাজ হলো রক্তকে ছেঁকে দূষিত পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করা। আর শরীরের প্রয়োজনীয় জিনিস আবার শরীরকে ফিরিয়ে দেওয়া। কিডনি রোগ নেফ্রোটিক সিনড্রোমে রক্তে থাকা প্রোটিনের বড়ো একটি অংশ প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। ফলে রক্তের জলীয় অংশ রক্তনালী থেকে বের হয়ে টিসুতে চলে আসে। ফলে শরীর ফুলে যায়। এসব রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। এটা ছোটো বড়ো সবারই হয়, তবে বাচ্চাদের এক থেকে ছয় বছরের মধ্যেই এই রোগের প্রবণতা বেশি। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই এটা বেশি হয়। এই সময়ে রোগীদের বমি বা বমিভাব, পেটে ব্যথা এবং শরীর অত্যধিক ফুলে যাওয়ার মতো লক্ষণ থাকে।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের প্রধান লক্ষণগুলি হচ্ছে পা, হাত, মুখ পেট, শরীর ফুলে যাওয়া; প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণ এলবুমিন (প্রোটিন) বের হয়ে যাওয়া; রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া; প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যধিক কমে যাওয়া।

কেন হয় নেফ্রোটিক সিনড্রোম ঃ বড়োদের ডায়াবেটিস থেকে এটি হতে পারে, ডায়াবেটিসের কারণে গ্লোমেরুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এমনটা হয়। বাচ্চাদের প্রধান ধরন কিন্তু মিনিমাল চেঞ্জ নেফ্রটিক সিনড্রোম যা স্টেরয়েড চিকিৎসায় ভালো হয়ে যায়। তবে এটি বারবার হতে পারে। খারাপ পর্যায়ে রোগটি ভালো না হয়ে কিডনি বিকলের দিকেও চলে যেতে পারে। মেব্রেনো প্রলিফারেটিভও খারাপ একটি ধরন। এসএলই দিয়েই এটা হতে পারে। এমাইলয়ডেসিস থেকেও এটি হয়।

এই রোগে চোখের চারদিক, হাত, পা, শরীর ফোলে কেন ঃ কিডনি শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন (এলবুমিন) ধরে রাখতে পারে না। কিডনির ছাঁকনি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলায় এই বড়ো সাইজের প্রোটিনও তখন শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

ফলে রক্তে এলবুমিনের স্বল্পতা দেখা দেয়, যার কাজ ছিল প্লাজমা অস্মোটিক প্রেসার ঠিক রাখা। তখন কোষের ফাঁকে রক্তের পানীয় অংশ জমতে থাকে। তাই চোখের চারপাশ, হাত, পা, শরীর ফোলা দেখা যায়।

এই অসুখে কী কী জটিলতা হতে পারে ঃ বাচ্চাদের নেফ্রোটিক সিনড্রোমের ৮০ শতাংশের উপরই হয় মিনিমাম চেঞ্জ যা সহজেই জটিলতা ছাড়াই ভালো হয়। তবে বাচ্চার অপুষ্টি একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। বড়োদের এবং কোনো কোনো বাচ্চার কিডনিতে যখন অন্য কোনো ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়, তখন অনেক দিন ধরে প্রোটিন ক্ষয় হতে থাকে আর জটিলতা বাড়তে থাকে। আর এই জটিলতা রোগের কারণেও হতে পারে আবার চিকিৎসার ওষুধের কারণেও হতে পারে। রোগের কারণে যা সচরাচর হয় তা হলো সংক্রমণ; পেটে সংক্রমণ (পেরিটোনাটিস), সেপসিস, চিকেন পক্স, সেলুলাইটিস। জল কমে যাওয়ার কারণে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা, প্রেসার কমে যাওয়া, শ্বাস কষ্ট। কোলেস্টেরল বেড়ে গিয়ে হৃদরোগ হতে পারে। এছাড়াও রক্তশূন্যতা, কিডনি বিকল, ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া।

অনেক দিন স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে কিছু শারীরিক সমস্যা হয়। যেমন মুটিয়ে যাওয়া, প্রেসার বেড়ে যাওয়া, চোখে ছানি পড়া, কুসিঙের মতো সব সমস্যা। এটাকে বলে আয়াট্রোজনিক কুসিং। আবার এলকালিনাইজিং ওষুধ, সাইক্লোস্পোরিন, সাইকোফসফামাইডের কারণেও অনেক সমস্যা হতে পারে।

এই রোগ হলে প্রোসেস্‌ড খাবার ও নুন যুক্ত খাবার এ সময়ে না খাওয়াই ভালো। চিপস, পপকর্ন, নুনযুক্ত বাদাম, সসেজ, হট ডগ, পেপারোনি খাবেন না। চিজ, শুকনো পাস্তা, আচার, নোনতা বিস্কুট বা ব্রেড খাবেন না। প্রোটিন প্রতি কেজি ওজনের জন্য এক গ্রাম বরাদ্দ, এর বেশি নয়। তবে ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শে কিছুটা শিথিলতা নেওয়া যায়, যা বাচ্চার স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

খাবারে থাকা নুন প্রতি বেলায় কোনোভাবেই ৪০০ মিলিগ্রামের বেশি হবে না। নুনের বদলে তাজা রসুন বা রসুনের গুঁড়ো দিয়ে খাবারের স্বাদ বাড়াতে পারেন। খাবার বাড়িতে তৈরি করুন, কারণ হোটেলের খাবারে বেশি নুন থাকে। নুন ছাড়া তরিতরকারি সিদ্ধ করে খেতে পারেন।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমে স্টেরয়েড দিয়েই বাচ্চাদের চিকিৎসা করা হয়। এটাতেই রোগ রিমিশনে আসে। তবে কখনো কখনো স্টেরয়েড একা কাজ না করলে সাইক্লোফস-ফামাইড বা সাইক্লোস্পোরিন দিতে হয়। এসিই ইনহিবিটর বা এসিই ইনহিবিটর রিসেপ্টর ব্লকার দিয়ে প্রোটিনোরিয়া বা প্রস্রাব দিয়ে প্রোটিন বের হয়ে যাওয়া কমানো যায়। ডাই ইরেটিকস্‌ দিয়ে প্রস্রাব বাড়ানো যায়।

প্রোটিন খুব বেশি কমে গেলে শিরায় এলবুমিন দিতে হয়। কখনো কখনো প্রেসার কমানোর ওষুধ ও কোলেস্টরল কমানোর ওষুধ প্রয়োজন হয়। নেফ্রোটিক সিনড্রোম প্রতিরোধ করা যায় না। তবে খাবারে পরিবর্তন এনে আর চিকিৎসা করে শরীরে জল আসা আর কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করা যায়। □

তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে বিদ্যাভারতীর প্রাদেশিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ৪ ও ৫ জুলাই হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে বিদ্যাভারতীর প্রাদেশিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট ১২টি শিশুমন্দির থেকে ২৪৮ জন ভাই-বোন, ৪০ জন আচার্য-আচার্যা এবং ক্রীড়া ভারতীর ২০ জন বিচারক উপস্থিত ছিলেন। ১২টি কাবাডি টিম, ১২টি খো খো টিম এবং ৫০ জনের যোগাসন টিম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন এমএমজি গ্রুপের ডিরেক্টর সোমনাথ দাস, কাবাডির জাতীয় কোচ অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত, ক্রীড়া ভারতীর সভাপতি বিশ্বজিৎ পালিত। এছাড়াও ক্রীড়া ভারতীর পক্ষে শুভেন্দু সরকার এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সম্পাদক তপন ভড়। কাবাডি খেলায় বালকবর্গের দ্বারহাট্টা সরস্বতী শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা প্রথম স্থান অধিকার করে, কাবাডি খেলায় বালিকা বিভাগে তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরের বোনেরা প্রথম স্থান অধিকার করে। কাবাডি কিশোর বিভাগে তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরের ভাইয়েরা প্রথম স্থান অধিকার করে। খো খো খেলায় কেশিয়াড়ি সরস্বতী শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা প্রথম স্থান এবং কাশিমবাজার তোষনিওয়াল সরস্বতী শিশুমন্দিরের বালক বিভাগের বোনেরা প্রথম স্থান অধিকার করে। কেশিয়াড়ি সরস্বতী শিশুমন্দিরের ভাইয়েরা কিশোর বিভাগে প্রথম স্থান এবং এগরা শিশুমন্দিরের বোনেরা প্রথম স্থান অধিকার করে। দু'দিনব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরের আচার্য- আচার্যাগণ।

মালদা শহরে ক্ষত্রিয় সম্মেলন

গত ২৬ জুন মালদা শহরের প্রখ্যাত ডায়াগনস্টিক সেন্টার ডিআরডিসি-তে অনুষ্ঠিত হলো মালদা জেলা ক্ষত্রিয় সম্মেলন। ১০০জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ডাঃ ফণীভূষণ রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ডঃ

অমলকান্তি রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি ডাঃ ভবানীচরণ সিংহ, কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক দীপঙ্কর কমল বর্মা, কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য তপন সরকার, ভরত অধিকারী, কেন্দ্রীয় কমিটির পর্যবেক্ষক সৌমেন রায়, মালদহ সমিতির সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার, সম্পাদক ভূপেশ চন্দ্র বর্মন। প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর ক্ষত্রিয় সমিতির ধ্যেয়গীত পরিবেশন করেন মালদহ সমিতির সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার। স্বাগত ভাষণ রাখেন ভূপেশ চন্দ্র বর্মন। তারপর ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণ সরকার ও মমতা সরকার। তারপর ভাষণ রাখেন সৌমেন রায়, ভবানীচরণ সিংহ ও ডঃ অমলকান্তি রায়। সম্মেলনে ইংলিশ বাজার ও পুরাতন মালদা নগরের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই দুই সমিতির পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেন জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার। সমাপ্তি ভাষণ রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ ফণীভূষণ রায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দীপঙ্কর কমল বর্মা। শান্তিমন্ত্রোচ্চরণের পর সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

মহাজাতি সদনে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ স্মরণ

বাংলা সাহিত্য, ভারতীয় সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রচেতনার এক অনন্য মেলবন্ধনের সাক্ষী থাকল ঐতিহাসিক মহাজাতি সদন। গত ২৯ জুন প্রকাশক, মুদ্রক ও পুস্তক বিক্রেতাদের সংগঠন 'বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদ'-এর উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত মহাজাতি সদনে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। স্মরণসভার আবহে সাহিত্য-সারস্বত সাধনা, সংস্কৃতি, প্রকাশনা শিল্প ও প্রকাশকদের জাতীয় দায়িত্ববোধ— এই চারটি বিষয়ই উঠে এলো অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের বক্তব্যে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী শমীক ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সহ-প্রচার প্রমুখ ড. জিষ্ণু বসু। অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ-এর অধিকর্তা তথা সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, প্রভু জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ মঠের সচিব পূজনীয় শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ ও সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর কন্যা শ্রীমতী মালিনী গুহ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের সভাপতি এবং রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সম্পাদক ও লেখক শ্রী দেবজ্যোতি চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় লেখক সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রী অনির্বাণ দে, কোষাধ্যক্ষ শ্রী অরিন্দম নাথ এবং পরিষদের সদস্যা ও সংস্কার ভারতীর সাহিত্য বিভাগ প্রমুখ শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা সরকার কবিরাজ।

'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'--- ঋগ্বেদের এই সংগঠন মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সম্পন্ন হওয়ার পর বঙ্গীয় শিল্পকলা পরিষদের কার্যকর্তা শ্রী ভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে রাষ্ট্রবন্দনা পরিবেশিত হলে সমগ্র মহাজাতি সদন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। স্বাগত ভাষণে সভাপতি শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেন যে, মহাজাতি সদনের মতো ঐতিহাসিক স্থানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বাংলা সাহিত্য জগতের জন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিবিজড়িত এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলান্যাস করা এই পবিত্র সদনে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে বৈদিক সাহিত্য থেকে চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতার উল্লেখ করে তিনি বলেন— সাহিত্যই সংস্কৃতির প্রকৃত বাহক। ধর্মীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সাহিত্যের মধ্যে যে কৃত্রিম বিভাজন দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করা হয়েছিল, আগামীদিনে তার অবসান ঘটিয়ে উভয় ধারার সৃজনশীল মিলনই নতুন সাহিত্যপ্রবাহের ভিত্তি গড়ে তুলবে। শ্রী শমীক ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে কলকাতা বইমেলার প্রসঙ্গ টেনে বলেন— 'কলকাতা বইমেলা কোনো একটি গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত থাকুক, সেটি অভিপ্রেত নয়।' তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রকাশনা জগতের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন।

গবেষক ড. জিষ্ণু বসু প্রকাশকদের সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন— 'রাষ্ট্র আমাদের মা। তাঁকে হৃদয়হীন মনোবৃত্তিতে ব্যবচ্ছেদ করা কাঙ্ক্ষিত নয়। প্রকাশকদের রাষ্ট্রের প্রতি বিরাট দায়িত্ব রয়েছে।' তিনি উনিশ শতকের সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য তিনি ব্রিটিশ শাসকের রোষানলে পড়েছিলেন। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমৃত্যু তিনি তাঁর কর্তব্য থেকে পিছিয়ে আসেননি।' একইসঙ্গে তিনি বর্তমান প্রজন্মের পাঠাভ্যাসের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, 'জেন-জি-জেন আলফা'র জন্য

উপযুক্ত বই নিয়েও প্রকাশকদের ভাবতে হবে।' অনুষ্ঠানের অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি হয় যখন বুদ্ধদেব গুহর কন্যা শ্রীমতী মালিনী গুহ বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন— তাঁর পিতার স্মৃতির উদ্দেশে এত বড়ো ও মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন হবে, তা তিনি কল্পনাও করেননি। বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন— এই সম্মান তাঁদের পরিবারের কাছে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্মরণসভায় অধ্যাপক ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য ও কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর অনবদ্য সাহিত্যকীর্তি, বাংলা সাহিত্যের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিচার পরিবারের উজ্জ্বল উপস্থিতি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সহ-সম্পাদক শ্রী সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, 'স্বস্তিকা'র পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, লোকপ্রজ্ঞা পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ এবং 'হিন্দি স্বস্তিকা' পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে, ধর্ম জাগরণ সমন্বয় সমিতি, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সংযোজক শ্রী রতন চক্রবর্তী, কাঞ্চী মঠের সন্ন্যাসী পূজনীয় বিশাখানন্দ তীর্থজী মহারাজ, রাষ্ট্রীয় লেখক সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি ড. রতন ঘোষ, বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ শ্রী মোহিত রায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত বিশেষ সহ-সম্পর্ক প্রমুখ শ্রী দীপক চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবী সুস্মিতা সেন, রণজয় বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন কলকাতা বইপাড়ার নয়টি প্রকাশক সংগঠনের প্রতিনিধি-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় ৮০০ জন প্রকাশক, লেখক, মুদ্রক, পুস্তক বিক্রেতা ও সাহিত্যপ্রেমী উপস্থিত ছিলেন, তেমন ছিলেন সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক জগতের একাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য ও প্রকাশনা জগতের এত বৃহৎ সমাবেশ দীর্ঘদিন পর মহাজাতি সদনের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে বলে উপস্থিত মহলের অভিমত। তাঁদের মতে, বরেণ্য সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহকে তাঁর জন্মদিবসে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে শুধু একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিককেই শ্রদ্ধা জানানো হয়নি; বাংলা সাহিত্য, ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রকাশনা শিল্পকে এক সুতোয় গেঁথে ভবিষ্যতের পথরেখাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বক্তব্যে যেমন সাহিত্যচর্চার নতুন দিগন্তের আহ্বান উঠে এসেছে, তেমনই প্রকাশনা জগৎকে সমাজ ও রাষ্ট্রনির্মাণের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বার্তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৮ জুন মধ্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট-স্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় 'অল বেঙ্গল প্রিন্সিপালস্ কাউন্সিল (অল ইউনিভার্সিটিজ)' বা 'নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদ'-এর ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। এদিনের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজক কমিটির পক্ষ হতে আমন্ত্রিত ছিলেন নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সকল সদস্য ও আজীবন সদস্য। সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ও 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর পর প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে সভার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী ও এদিনের সভার প্রধান অতিথি ড. স্বপন দাশগুপ্ত। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং এদিনের সভার বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. আশুতোষ

ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক ড. জয়ন্ত সিংহ এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ ও নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজক কমিটির সভাপতি ড. পঙ্কজ কুমার রায়। উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বক্তব্যে উপস্থাপিত হয় এরাজ্যের উচ্চশিক্ষা-সহ শিক্ষা ও গবেষণা জগতের নেতৃত্ব ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষত কলেজগুলির অধ্যক্ষদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও তাঁরা বক্তব্যে উল্লেখ করেন। মঞ্চাসীন অতিথিরা নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি স্মরণিকা গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন করেন। সভার প্রথম পর্বের সমাপ্তির পর মধ্যাহ্নভোজের বিরতি ঘোষিত হয়। বিরতির পর পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার দ্বিতীয় পর্বের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

‘ব্যারিস্টার থেকে ফকির’-শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রকাশিত হলো ‘দেশবন্ধুর সুভাষ’

গত ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণের ১০১তম দিবসে দক্ষিণ কলকাতায় চেতলা-স্থিত হিন্দ সঙ্ঘের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সভাগৃহে দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি, হিন্দ সঙ্ঘ ও নেতাজী চেতনা মঞ্চের পরিচালনায় এবং নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় ‘ব্যারিস্টার থেকে ফকির : ত্যাগের এক অনন্য আলেখ্য’-শীর্ষক একটি আলোচনাসভা। এদিনের সভার প্রধান বক্তা ছিলেন শুভাশিস চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ছিলেন— প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রশাসক (বক্সিং) অসিতবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টস্-এর কিউরেটর দীপককুমার বড় পণ্ডা, দীপ প্রকাশনের প্রকাশক দীপ্তাংশু মণ্ডল, দীপ প্রকাশনের সিইও সুকন্যা মণ্ডল, পোয়েটস্ ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ চৌধুরী, দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম-এর সম্পাদক শুভেন্দ্র মল্লিক ও দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি-র সম্পাদক সন্দীপ দত্ত। সমবেত কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র সভাপতি প্রণব গুহ বলেন— দেশবন্ধু, নেতাজী ও স্বামী বিবেকানন্দের সেবার আদর্শ সকলের পাথেয় হয়ে উঠুক। এদিনের আলোচনাসভায় প্রকাশিত হয় নেতাজী-গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী রচিত পুস্তক— ‘দেশবন্ধুর সুভাষ’। দীপ প্রকাশন হতে প্রকাশিত এই বইটিতে ‘চিঠিপত্র’-এর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আলোকে তুলে ধরা হয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের তাঁদের সম্পর্কের নানা অধ্যায়। ড. জয়ন্ত চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, জাতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রই প্রথম বঙ্গপ্রদেশকে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। তাঁদের দেশপ্রেম ও সেবাব্রতের মূল্যায়ন ইতিহাসের স্বার্থেই আজ জরুরি।

দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি ও দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম— এই দু’টি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সম্পাদক যথাক্রমে সন্দীপ দত্ত ও শুভেন্দ্র মল্লিক দেশবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং প্রতিষ্ঠান দু’টির সংগ্রামী ঐতিহ্য তুলে ধরেন। গবেষক শুভাশিস চৌধুরী তাঁর ‘ব্যারিস্টার থেকে ফকির’ বক্তৃতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংগ্রামী জীবনের কথা উপস্থাপন করেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোপাল দাস। দেশবন্ধু রচিত কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পার্থসারথি নাথ। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্য-সদস্যা-সহ অনেক ছাত্র-ছাত্রী সভায় উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রিয়াঙ্কা কারতি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রিয়ম গুহ।

রায়গঞ্জে ক্ষত্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা সম্মেলন

গত ১১ ও ১২ জুলাই ক্ষত্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকারিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো রায়গঞ্জ সারদা শিশুতীর্থে (বাংলা মাধ্যম)। উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য দশরথ বর্মন, পরিমল চন্দ্র রায়, ডাঃ ফণীভূষণ রায়, কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি ভবানীচরণ সিংহ, সম্পাদক প্রেমানন্দ অধিকারী, হেমতাবাদের বিধায়ক হরিপদ বর্মন, কুশমণ্ডীর বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ প্রণব রায়, কালিয়াগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজয় সিংহ-সহ শতাধিক প্রতিনিধি। সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়— এক, রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলভুক্ত করতে হবে। দুই, কলকাতায় ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা। তিন, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনী স্কুলপাঠ্য করতে হবে। চার, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন শুধু ছুটি নয়, অবশ্য পালনীয় করতে হবে। পাঁচ, হেমতাবাদে নতুন মহাবিদ্যালয়ের নাম ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নামে করা হোক। হেমতাবাদের বিধায়ক ঘোষণা করেন, হেমতাবাদে যে নতুন স্টেডিয়াম তৈরি হবে তার নাম ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নাম রাখা হবে।

রবীন্দ্র সদনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী ও ‘বন্দে মাতরম্’-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

গত ২৬ জুন ‘সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরাম’-এর উদ্যোগে রাষ্ট্রঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী ও রাষ্ট্রজাগরণের মহামন্ত্র ‘বন্দে মাতরম্’-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কলকাতায় রবীন্দ্র সদনে ‘পশ্চিমবঙ্গ : মহিমা, গরিমা, সম্ভাবনা’-শীর্ষক একটি ভব্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন নৈহাটির বিধায়ক ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর প্রজন্ম শ্রী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ শ্রী দুর্গাপ্রসাদ সাহু। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরামের ম্যানেজিং ট্রাস্টি শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী। অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রী সারদা প্রসাদ পাল এবং বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সৌরভ ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. রাকেশ দাশ। প্রধান অতিথি-সহ সব বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর রচিত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস ও রাষ্ট্রজাগরণের বীজমন্ত্র, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঞ্জীবনী মন্ত্র ‘বন্দে মাতরম্’-এর মাহাত্ম্য তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে উপস্থাপন করেন। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা সহস্রকণ্ঠে রাষ্ট্রমাতার বন্দনা ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রতার জয়যাত্রার দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্র ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কারাবরণকারী সত্যাগ্রহীদের এদিনের অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি দেবাশিস লাহিড়ী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য।

গত ১২ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া নগরের রবীন্দ্র মিলনের উদ্যোগে এবং পলাশতলা মহাশ্মশান সমিতির সহযোগিতায় পলাশতলা মহাশ্মশান পরিসরে বৃক্ষরোপণ মহোৎসব উপলক্ষ্যে শতাধিক বিভিন্ন বৃক্ষ রোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বস্তিকা পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক মোহন চট্টোপাধ্যায়, মিলন প্রমুখ লক্ষ্মীকান্ত মাইতি-সহ বহু স্বয়ংসেবক।

ফ ঃ ৪

বাগনানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ৬ জুলাই হাওড়া জেলার বাগনানে হিজলক মোড়ে 'হিজলক পাতিনান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জন্মোৎসব কমিটি'র উদ্যোগে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ভারতমাতা ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে, পুষ্পস্তবক-সহ বরণ করে নেওয়া হয়। বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করেন। এদিনের সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সহ-প্রান্ত প্রচার প্রমুখ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী, অখিল ভারতীয় পূর্বসৈনিক সেবা পরিষদ-এর রাজ্য সভাপতি কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সমীরণ রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী রণজয় বিশ্বাস, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি-র দক্ষিণবঙ্গ সহ-প্রান্ত কার্যবাহিকা শিবানী চট্টোপাধ্যায় ও জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কান্তিরঞ্জন সামন্ত, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পূর্বতন কার্যকর্ত্রী রুমা সামন্ত ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা কৌশিক শাসমল। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ দীপঙ্কর পতি। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহাজীবনের বিভিন্ন দিক বক্তারা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। অসংখ্য জাতীয়তাবাদী মানুষের সমাগমে সভাস্থল ছিল পরিপূর্ণ। বক্তাদের বক্তব্যের শেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ দীপঙ্কর পতি। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্ব নির্বাহ করেন সুরজিৎ দাস।

সংস্কার ভারতীর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মদিবস পালন অনুষ্ঠানে জেলা সংস্কৃতি দপ্তরের আমন্ত্রণে সংস্কার ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সমিতি অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন জেলা উপ তথ্য অধিকর্তা তথা ভারপ্রাপ্ত তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীমতী অনন্যা মজুমদার, বিধায়িকা পাপিয়া অধিকারী, বিধায়িকা শর্বরী মুখার্জী-সহ জেলার বিভিন্ন আধিকারিকগণ। উপস্থিত সকলেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও আদর্শ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্কার ভারতীর উপস্থাপনায় পরিবেশিত হয় শ্রুতিনাটক— **রূপকার**। রচনা– অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, নির্দেশনা- প্রশান্ত দত্ত। পরবর্তী পর্বে মোনালিসা ঘোষের কলাজ্যোতি গুরুকুলের স্বদেশী সঙ্গীতের নৃত্যানুষ্ঠান এবং শেষপর্বে সংস্কার ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সঙ্গীত গোষ্ঠীর সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশনা। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন পাপিয়া ভট্টাচার্য। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

দত্তপুকুরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস স্মরণ

গত ২৭ জুন উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় দত্তপুকুরে 'ড. শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতি'র উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস স্মরণে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। 'কৃষ্টিনীড় কলাক্ষেত্র'-এর নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশিত ভগবান শিবশঙ্কর, শ্রীশ্রীজগন্নাথস্বামী ও দেবী সরস্বতী বন্দনার মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা ভারতমাতা ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করেন বিশিষ্ট আইনজীবী সৌম্যদীপ কুণ্ডু। আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. বিমলশঙ্কর নন্দ, বিশিষ্ট লেখক ও পরিবেশবিদ মোহিত রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. অরূপ ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট আইনজীবী রণজয় বিশ্বাস। আলোচনাচক্রে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট লেখক ড. গোপাল চক্রবর্তী। বক্তাদের বক্তব্যে এদিন বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন-সংগ্রাম, বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টিতে তাঁর অবদান এবং বর্তমান যুগেও তিনি ও তাঁর আদর্শ কতটা প্রাসঙ্গিক--- সেই সংক্রান্ত বৃত্তান্ত তাঁরা বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সমাজের প্রান্তিক ক্ষেত্রে জনসেবামূলক কাজে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। জাতীয়তাবাদীদের সমাগমে এদিন সভাকক্ষটি ছিল পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি কার্তিক সমাদ্দার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট শিক্ষক বিধান বিশ্বাস।

আলমবাজারে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

সংস্কৃতভারতী দক্ষিণেশ্বর চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে আলমবাজার ঘাট সেবাকেন্দ্র ও পুস্তকালয়ে আয়োজিত দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির গত ৩০ জুন শুরু হয়ে ১২ জুলাই সমাপ্ত হয়।

শিবিরে ২৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শিক্ষক, পুরোহিত, ব্যাস (কথক), চাকুরিজীবী, আইনজীবী, গবেষক, গৃহবধূ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী-সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি ছিল।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিবিরের শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতভাষায় সম্ভাষণ, সংলাপ এবং বিভিন্ন উপস্থাপনার মাধ্যমে তাঁদের অর্জিত ভাষাদক্ষতার পরিচয় দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিকা এবং সংস্কৃত গৃহিণী হিসেবে সুপরিচিত ডঃ মৌমিতা বর। তিনি সংস্কৃতকে প্রথম ভাষা হিসেবে ব্যবহারকারী দুই সন্তানের জননী হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সংস্কৃতভাষা চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষার্থীরাও তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং সংস্কৃতভাষায় নিয়মিত কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। অনুষ্ঠানে দক্ষিণেশ্বর চর্চাকেন্দ্রের চারটি নিয়মিত কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়--- এক, সাপ্তাহিক সংস্কৃত মাতৃশক্তি মিলন। দুই, সাপ্তাহিক সংস্কৃত বালকেন্দ্র। তিন, সাপ্তাহিক গীতাচর্চাকেন্দ্র। চার, ঝোলা পুস্তকালয়। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে অংশগ্রহণকারী সকলেই গঙ্গা দর্শন করেন এবং সংস্কৃতভাষায় পারস্পরিক সম্ভাষণ ও সৌহার্দ্য বিনিময় করেন। পরিশেষে স্মারক আলোকচিত্র গ্রহণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খড়দহে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন

গত ১২ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ অভিযান রাষ্ট্র কল্যাণ (স্পার্ক), দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির এবং কর্মযোগী সেবা সমিতি-র যৌথ উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহে 'স্বামী পুণ্যানন্দ মুক্ত মঞ্চ' প্রাঙ্গণে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ভারতকেশরীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টি-সহ সমগ্র দেশে 'এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান'-এর দাবিতে তাঁর সংগ্রামের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণমন্ত্রী ও খড়দহের বিধায়ক অধ্যাপক ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'স্পার্ক, পশ্চিমবঙ্গ'-এর মুখ্য সংযোজক সুভাষ গুহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও লেখক দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, খড়দহ বিধানসভা স্পার্ক আহ্বায়ক, কর্মযোগী সেবা সমিতি-র সভাপতি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রামকৃষ্ণ মিশন অ্যালামনি-র কোষাধ্যক্ষ ও দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির-এর সদস্য শান্তনু রুদ্র, দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির-এর সভাপতি ডঃ সুশান্ত মজুমদার, কর্মযোগী-র সম্পাদক সুব্রত দত্ত, দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির-এর সম্পাদক মিলন খামারিয়া এবং ভারতীয় জনতা পার্টির গুড গভর্ন্যান্স

সেল-এর রাজ্য আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট শিক্ষক দীপল বিশ্বাস।

এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দান করেন মিলন খামারিয়া। সুভাষ গুহ তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, গত ৯ মে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে ভারতমাতার সেবাব্রতী সনাতনী বঙ্গসন্তানদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। ভারতকেশরীর আদর্শে ব্রতী হয়ে তাঁর উপদেশ ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা অবলম্বন করে ক্লিষ্ট, জর্জরিত বাঙ্গালি জাতি আগামীদিনে নিজেদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে। এরপর 'আনন্দমঠ' গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পরিবেশিত হয় নানান সাংস্কৃতিক নিবেদন। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ডঃ রুবেল পাল ও তাঁর সহযোগী শিল্পীরা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভজন ও কয়েকটি মনোগ্রাহী দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে এদিনের অনুষ্ঠানকে এক অন্য পর্যায়ে উন্নীত করেন। নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে— রাষ্ট্রবিরোধীদের হাতে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিন ভয়াবহ উপেক্ষাই শুধু নয়, তাঁর স্মৃতির প্রতি অবহেলা ও ভয়ানক লাঞ্ছনার সেই দিনগুলি স্মরণ করে এদিনের এই আবক্ষমূর্তি স্থাপনকে অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের বলে উল্লেখ করেন। দেশাত্মবোধ জাগরণের মধ্য দিয়ে তিনি এরাজ্যের গৌরবান্বিত এক ভবিষ্যৎ সৃষ্টির ডাক দেন। তাঁর ও বিশিষ্ট অতিথিদের করকমলে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং মূর্তিতে মাল্যদান হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন খড়দহ স্পার্ক কমিটি-র কার্যকর্তা পার্থ দত্ত। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সহৃদয় সনাতনীদের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিউটাউনে 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : নতুন ইতিহাসের খোঁজে'-শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ৭ জুলাই ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারের হল নং-৭-এ আয়োজিত হয় একটি পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদিনের কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। এরপর সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ও 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর মধ্যে দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন— রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, পূর্বতন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জিষ্ণু বসু। বিশিষ্ট অতিথিরা অধ্যাপক প্রণবকুমার সাহা সম্পাদিত ও প্রকাশক সংস্থা 'সোপান' প্রকাশিত 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ নতুন ইতিহাসের খোঁজে' পুস্তকটির আবরণ উন্মোচন করেন।

বইটির সহ-সম্পাদক হলেন শ্রী অভিজিৎ প্রধান। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহাজীবনের বিভিন্ন আঙ্গিক উপস্থাপন করেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে আবরণ উন্মোচিত হওয়া বইটিতে উল্লেখিত বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন বইটির সম্পাদক অধ্যাপক প্রণবকুমার সাহা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে এদিনের কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জীবনে চলার পথে পথ-প্রদর্শক হলেন গুরু

সূর্য শেখর হালদার

বিশ্বে ভারতের পরিচয় তার সনাতন সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতি এভাবেই শ্রদ্ধা জানায় গুরুকে। এর অর্থ এটাই যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরু এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। গুরু শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ‘গু’ ও ‘রু’ এর সমন্বয়ে তৈরি। গুরু শব্দের অর্থ ‘অন্ধকার’ আর ‘রু’ এর অর্থ হলো ‘বিনাশক’। অর্থাৎ শিষ্যের হৃদয়ের অন্ধকার যিনি নাশ করেন তিনিই হলেন গুরু। গুরুর প্রতিশব্দ শিক্ষক হতে পারে না। শিক্ষক প্রথাগত শিক্ষা দান করেন, কিন্তু গুরু শব্দের তাৎপর্য আরও অনেক গভীর। তিনি শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেন। তাই অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি এই গুরু শব্দটিকে সরাসরি ইংরেজি ভাষায় গ্রহণ করেছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে ‘গুরু’ বলে কিছু হয় না, তাই গুরুর কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই।

ভারতীয় পরম্পরাতে গুরুর অস্তিত্ব অতি প্রাচীন। ভারত তথা পৃথিবীর আদি কাব্য রামায়ণে রাজা দশরথের কুলগুরু ছিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠ। আর রাজগুরু ছিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র কিশোর রামকে জ্ঞানের আলো দেখিয়ে ধর্ম ও দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাড়কা রাক্ষসী বধের সময় রাম ইতস্তত করছিলেন তাড়কাকে বধ করতে, কেননা তাড়কা রাক্ষসী হলেও একজন নারী। রাজগুরু বিশ্বামিত্র তখন বোঝালেন প্রজা রক্ষার নিমিত্ত কোনো নৃশংস বা দোষযুক্ত কর্ম, এমনকী স্ত্রী হত্যা করলেও সেটা সনাতন ধর্মে পাপ হয় না (বাল্মীকি রামায়ণ : বাল কাণ্ড : সর্গ ২৫ : শ্লোক ১৮-১৯)।

মহাভারতের কথা উঠলেই আমাদের স্মরণ হবে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের প্রসঙ্গ, কিন্তু গুরু দ্রোণ ছিলেন আসলে এক বেতনভুক শস্ত্র শিক্ষক। তিনি পাণ্ডব ও কৌরবদের শিক্ষা শেষে তাঁদের থেকে গুরুদক্ষিণা চান যে রাজকুমাররা পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা দ্রুপদকে বন্দি বানিয়ে নিয়ে আসুক। তাঁর এই রূপ গুরুদক্ষিণা চাওয়ার কারণ ছিল দ্রুপদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুতা। কিন্তু একজন প্রকৃত গুরু, শিষ্যের মাধ্যমে এরূপ নিজের স্বার্থসিদ্ধির বা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের কাজ করতে পারেন না। তাই মহাভারতে প্রকৃত গুরু তিনি নন। বরং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং পরমাত্মা, যিনি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে (জীবাত্মার প্রতীক) জীবনে চলার প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন, অর্জুনের মনের অন্ধকার দূর করে তাঁকে আলোকোজ্জ্বল পথে নিয়ে আসেন।

ভারত ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতেও এরকম অনেক গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অখণ্ড ভারত নির্মাণের যে প্রচেষ্টা, তার অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন গুরু চাণক্য বা কৌটিল্য। বহিরাগত ইসলামি শাসক আকবরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে নরশার্দুল রাণা প্রতাপকে সাহস ও উপদেশ দেন গুরু রাঘবেন্দ্র। শিবাজীকে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতে ছোটোবেলাতেই প্রেরণা দেন গুরু দাদাজী কোণ্ডদেব। পরে সমর্থস্বামী রামদাস। আর ভারতীয় সংস্কৃতিকে যিনি সারা পৃথিবীতে বিস্তারিত করেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

মহান ঐতিহাসিক চরিত্রদের মহান করে তোলার জন্য গুরুদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুর স্থান ঈশ্বরসম। গুরু সনাতন সংস্কৃতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর জন্য একটি প্রবচনে বলা, যেখানে গোবিন্দ (ঈশ্বর) আর গুরু দুজনেই দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন ভক্ত কাকে আগে প্রণাম করবে? এই প্রবচনেই রয়েছে সমাধান। আগে ভক্ত গুরুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে, কৃতজ্ঞতা জানাবে, কারণ গুরুই আমাদের ঈশ্বর চেনান।

ঠিক এই কারণেই গুরুপূর্ণিমা পালন সনাতন সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। হিন্দু পঞ্জিকার আষাঢ় মাসের যে পূর্ণিমা, সেটাই হলো গুরুপূর্ণিমা তিথি। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী আদিদেব মহাদেবই হলেন আদিগুরু। তিনি এই বিশেষ তিথিতে আদি গুরু হয়ে সপ্তর্ষিকে (অত্রি, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গীরা, পুলস্ত্য, মরিচি, ক্রতু) মহাজ্ঞান দেন। অনেকে মনে করেন গুরুপূর্ণিমা হলো মহাকবি বেদব্যাসের আবির্ভাবতিথি। তাই এই তিথি ব্যাসপূর্ণিমা নামেও খ্যাত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেদব্যাস মহাভারত ছাড়াও পুরাণের রচনাকার এবং চতুর্বেদের সম্পাদক। বৌদ্ধ মতেও এই তিথির প্রভূত গুরুত্ব রয়েছে। এই তিথিতে বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত ভগবান বুদ্ধ উত্তরপ্রদেশের সারনাথে প্রথম উপদেশ দান করেন। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি নেপালে তিথিটি শিক্ষক দিবস রূপে পালন করা হয়।

মনুষ্য জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হলো মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভ করতে গেলে প্রয়োজন চৈতন্য লাভের। আর চৈতন্য লাভ করতে হলে বুঝতে হবে পরমেশ্বর তত্ত্ব। মানুষ আর পরমেশ্বরের মধ্যে যে সেতু, সেই সেতুই হলো গুরু। গুরু প্রদত্ত জ্ঞানই আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে, অসৎ থেকে সৎ পথে নিয়ে

আসে। আজকাল আমরা দেখি সমাজ ও দেশ থেকে আমরা কী পাচ্ছি, কী পেয়েছি, আর কি পাব— সর্বদা তারই হিসেবনিকেশ চলছে, এমনকী শিক্ষিত সমাজও এই হিসেবে ব্যস্ত। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রকৃতিতে তথা জীবজগতে সবাই কিন্তু পাবার সঙ্গে সঙ্গে দিয়েও থাকে। বৃক্ষ মাটি থেকে জল ও খনিজ উপাদান সংগ্রহ করে। পরিবর্তে অক্সিজেন দেয়। জীব জগতের প্রতিটি প্রাণী তা গ্রহণ করে। আবার ধূপ জ্বলে, আর আমরা তার সুগন্ধ পাই। কিন্তু ধূপ নিজে জ্বলে শেষ হয়ে যায়। বৃক্ষ বা ধূপের মতো ত্যাগের শিক্ষা আজকাল মানুষ প্রায় ভুলে গেছে। তাই প্রকৃতি ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে মানুষ। অর্থ রোজগারের উদ্দেশ্যে অবলীলায় ধ্বংস করছে প্রকৃতিকে, যা তার নিজের আধার। সবচেয়ে বুদ্ধিমান হয়েও মানুষ আজ বিপথগামী। এই বিপথগামিতা রোধ করার জন্যই প্রয়োজন গুরুর। গুরুপূজন মানুষের বুদ্ধির অহংকার দূর করে; তার মধ্যে সমর্পণের ভাব জাগিয়ে তোলে। আমরা কে না জানি, অর্জুনের সমর্পণ ভাবই তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করেছিল।

ভারতের সনাতন সংস্কৃতিকে মাথায় রেখেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গুরুপূর্ণিমা উদ্যাপনের আদর্শ গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এটি একটি উৎসব, যা প্রতি বছর মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গুরু কে? উত্তরে বলা যায় সঙ্ঘের গুরু কিন্তু কোনো ব্যক্তি নয়; বরং একটি তত্ত্ব, যার বহিঃপ্রকাশ হলো অগ্নিবর্ণ গৈরিক ধ্বজ। তত্ত্ব হলো শাশ্বত, কিন্তু ব্যক্তি তা নয়। তাই সঙ্ঘ ব্যক্তি নয়, তত্ত্বকে গুরু হিসেবে পূজা করে। প্রজ্বলিত শিখার মতো গৈরিক ধ্বজ ত্যাগ ও সমর্পণের প্রতীক। অগ্নি নিজেকে প্রজ্বলিত করে জগৎকে আলো প্রদান করে। সূর্য নিজে জ্বলে রাষ্ট্র ও সমাজকে আলোক শিখা প্রদর্শনের প্রতীক। এছাড়াও গৈরিক রং ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক বিশেষ সম্মানের অধিকারী। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় ঋষি ও সাধুগণ গৈরিক বস্ত্র পরিধান করতেন। মহর্ষি দধীচি যেমন সমাজের কল্যাণের জন্য নিজের অস্থি উৎসর্গ করেছিলেন, গেরুয়া বসনধারীরাও ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নয়নের স্বার্থে ত্যাগব্রত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়েই ধ্বজের রং হয়েছে গৈরিক। মনে রাখতে হবে, ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকারও সবচেয়ে উপরে রং হলো গৈরিক।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমগ্র ভারতীয় তথা হিন্দু সমাজকে রাষ্ট্রীয়তার তথা মাতৃভূমির আধারে সংগঠিত করার কাজ করে থাকে। তাই কোনো ব্যক্তিকে গুরুর আসনে না বসিয়ে যজ্ঞের জ্বালাময়ী অগ্নি তথা ত্যাগের প্রতীক গৈরিক ধ্বজকে গুরুর আসনে আসীন করেছে। মহর্ষি দধীচি প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন যাতে করে তাঁর অস্থি থেকে বজ্রায়ুধ তৈরি হতে পারে, আর সেই অস্ত্র অসুর বধ করতেও জগৎ কল্যাণের কাজে লাগে। একজন স্বয়ংসেবকেরও সেইরূপ সমর্পণ ভাব মনের মধ্যে জাগ্রত হয়, কেননা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতে ব্যক্তির শক্তি, বুদ্ধি ও সম্পদের উপর অধিকার ব্যক্তির নয়; বরং সমাজ তথা রাষ্ট্রের। ব্যক্তি তার থেকে ঠিক ততটুকুই নেবে, যতটুকু বাঁচার তাগিদে তার প্রয়োজন। বাকিটুকু সে দান করবে সমাজ তথা রাষ্ট্র রূপী পরমেশ্বরকে। উদ্দেশ্য, সমাজ তথা রাষ্ট্রের হিতসাধন। এই মনোভাবই হলো সমর্পণ ভাব আর সেই মনোভাবকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী (কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার) গুরুপূজন উৎসব চালু করেন।

সঙ্ঘের প্রতিটি স্বয়ংসেবক মনে রাখেন, সমাজ থেকে আমরা যা পাই, তা অন্য কেউ প্রদান করে বলেই আমরা পাই। তাই আমাদের উচিত আমাদের শক্তি, বুদ্ধি আর সম্পদ সমাজ হিতে দান করা। আমাদের শক্তি, বুদ্ধি, সম্পদ-আসলে সবই সমাজের। সূর্য পূজার সময় আমরা যেমন নদীর জল নদীতেই অর্ঘ্য হিসেবে প্রদান করি, সেই রূপ আমাদের শক্তি, বুদ্ধি ও সম্পদ যা আমরা সমাজ থেকেই প্রাপ্ত করি, তা সমাজ হিতেই প্রদান করা উচিত। এখানে 'আমি' অহং-এর কোনো স্থান নেই। মুচি, মেথর, ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী : কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী : গুজরাট থেকে অরুণাচল : গ্রাম থেকে নগর : মফস্সল থেকে বড়ো শহর— সবাই সমাজ হিতেই অবিরত কর্ম সম্পাদন করছে। সমাজ তথা রাষ্ট্রহিতে ত্যাগ ও কর্মসম্পাদনের ভাবই কিন্তু আমাদের একত্রিত করেছে, জাতি হিসেবে গঠিত করেছে। এই আত্মোৎসর্গের ভাব দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে আমরা পরিবারের উন্নতির জন্য কাজ করব না। কিন্তু পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের উচিত সমাজ তথা দেশের জন্যও কিছু সেবা ও সময় প্রদান করা। এই আত্মোৎসর্গের ভাবই আমাদের সংস্কৃতি। সমাজে এই ভাবনা প্রতিস্থাপন করলে আমরা হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা এবং ভ্রষ্টাচার মুক্ত হতে পারব। গড়ে তুলতে পারব এক সুস্থ, সুন্দর, শক্তিশালী সমাজ তথা রাষ্ট্র। এই কথা স্মরণ করেই ডাক্তারজী ও নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভেবে, সমাজ রাষ্ট্র গঠনের জন্য স্থাপন করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন আজ এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে ত্যাগের আদর্শকে সামনে রেখেই।

সমাজ তথা রাষ্ট্র নির্মাণ ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু আজকের সমাজে আমরা দেখছি বস্তুবাদ আর ভোগবাদের আধিক্য। মানুষ আজ সর্বদা কিছু পাবার জন্য ছুটছে, ভ্রষ্টাচার ও অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হচ্ছে। সবাই যখন সেবাদানের আদর্শে ব্রতী হবে, তখনই সুস্থ, সুন্দর ও শক্তিশালী সমাজ গঠিত হবে। এই সেবাদান তখনই সম্ভব, যখন আমরা হব অহংমুক্ত ও সমর্পিত। আর এই সমর্পিত ভাব জাগানোর জন্যই প্রয়োজন গুরুপূজন। তমসা থেকে জ্যোতির পথে নিয়ে যেতে পারে একমাত্র গুরুই। □

রাষ্ট্রহিতে সমর্পণই গুরুপূর্ণিমার সত্যার্থ

দেবব্রত ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষে অনাদিকাল হতে বহমান গুরুপরম্পরা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুর পদকেই সর্বোচ্চ মান্য করা হয়েছে। গুরুপদপ্রান্তে নিরহংকারে বসে নিরন্তর জ্ঞানের অন্বেষণই ভারতের মূলাধার। পুরাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জ্ঞানচর্চার সেই অবিরল ধারাই আসমুদ্রহিমাচল জনমানসে সঞ্চারিত করে এসেছে ঐক্যের শক্তি। ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে আষাঢ়ী পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পালনীয় পর্ব হিসেবে সেই সামূহিক শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ।

মহর্ষি বেদব্যাস ভারতীয় সংস্কৃতির আদিগুরু। তিনি যে শুধুমাত্র মহাভারত রচনা করেছিলেন তাই নয়, তিনিই প্রথম সত্যদ্রষ্টা ঋষিদৃষ্ট অপৌরুষেয় বেদ-কে চার ভাগে বিভক্ত করে ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার বীজকে ভারতভূমিতে সুপ্রোথিত করে গিয়েছেন। তিনিই 'ব্রহ্মসূত্র' নামে বেদান্ত দর্শনের আকর গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। আচার ও বিচারের সার্থক সমন্বয় স্থাপন করে তিনি ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের পথদর্শন করে গেছেন। কৃতজ্ঞ ভারত তাই ভগবান বেদব্যাসকে জগদ্‌গুরু, তথা 'ব্যাসো নারায়ণম্ স্বয়ং' বলে বরণ করে নিয়েছে। এই দৃষ্টিতে গুরুপূর্ণিমাকে ব্যাসপূর্ণিমাও বলা হয়।

ভারতীয় দৃষ্টিতে এই সৃষ্টি অখণ্ডমণ্ডলাকারা। চরাচরব্যাপী পরমপ্রকৃতির ক্ষুদ্রতম বিন্দু থেকে সৃষ্টির সঞ্চালক অনন্ত আদিশক্তি, যাকে পরমতত্ত্ব জ্ঞানে আমরা অর্চনা করে থাকি, সেই বিস্তৃতি পর্যন্ত এক সহজ সম্পর্ক বিদ্যমান। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর তত্ত্বের মধ্যকার সেই সহজ সম্পর্ক অনুভব করার প্রয়াস আমরা যাঁর চরণে বসে করে থাকি, তিনিই গুরু।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৪তম শ্লোকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন :

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।'

> 'অহংকার, ঈর্ষা, লোভ, স্বার্থের রেষারেষি অত্যধিক বেড়ে গেছে। এই সমস্ত আসুরিক শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য ত্যাগ, তপস্যা, সত্য, প্রেম ও করুণার মতো সদ্‌গুণ নিজের জীবনে নিয়ে আসাই হলো শিবসাধনা, গুরুপূজন।'

অর্থাৎ, গুরুর কাছে গিয়ে সত্যকে জানতে চিনতে ও অনুভব করার চেষ্টা করো। তাঁকে সমর্পিত ভাবে জিজ্ঞাসা করো, তাঁর সেবা করো। স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিই তোমাকে সেই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন, কারণ তাঁর সত্যদর্শন হয়েছে।

সম্পূর্ণ সৃষ্টিই চৈতন্যময়। চর, অচর সর্বত্রই একই ঈশ্বরতত্ত্ব বিদ্যমান। তাঁকে হৃদয়ে অনুভব করে, সৃষ্টির ভারসাম্যকে বজায় রেখে, সৃষ্টির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে জীবনধারণ করাই মানুষের কর্তব্য। পাশ্চাত্যের মানসিকতায় সৃষ্টিকে জয় করার যে ভাবনা, তা হলো বিকৃতি; প্রকৃতির বুকে সহজাত জীবনযাপনই সংস্কৃতি— সমগ্র সৃষ্টিই পরস্পর পরিপূরক। ত্যাগ, সমর্পণ, সমন্বয়— এই হলো হিন্দু সংস্কৃতির মূল দর্শন।

বর্তমানে মানবসমাজ আপন দুরাচারের আবর্তে পড়ে প্রকৃতির রুদ্ররোষের শিকার। মানুষ ছাড়া সৃষ্টির যাবতীয় জীবকুল নিরন্তর প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে, তাদের প্রাকৃতিক ব্যবহার ঠিক রাখে। কেবল মানুষই একমাত্র জীব যার ভোগবাসনা যুক্ত স্বৈরাচারের ফলে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে অতলান্ত সমুদ্রতল, এমনকী অন্তরীক্ষ পর্যন্ত আজ চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। কোটি কোটি বছরের অনাবিল নৈসর্গিক প্রকৃতি, বিগত মাত্র দু'শো বছরের অনিয়ন্ত্রিত মনুষ্যকৃত বিকাশের ফলে চরম প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার কবলে। লাগামহীন পরিবেশ-দূষণ শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সমস্ত জীববৈচিত্র্যকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। মহামারী, অতিমারী কবলিত প্রকৃতি ও সমাজকে পুনর্বার তার ন্যায্য অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলে হিন্দু সংস্কৃতির ত্যাগ ও সমর্পণের মূল দর্শনে আবার ফিরতেই হবে। রাস্তা দেখাবেন গুরু।

গুরুর ভেতরে ঈশ্বরতত্ত্বের সগুণ প্রকাশ হলেন গুরু। আমাদের সমাজে সহস্র সহস্র বছর ধরে গুরু পরম্পরা প্রচলিত রয়েছে। স্মরণাতীতকাল থেকে ভগবান ব্যাসদেব থেকে শুরু করে বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়েই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবহমান রয়েছে। কোটি

কোটি মানুষ নিজের পছন্দের রীতিনীতি অনুযায়ী শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের জীবনে গুরুবরণ করে নিয়েছেন। অটুট রয়েছে ঋষি পরম্পরা। যে কারণে বহিরাগত শত্রুর শত আক্রমণের পরও আমাদের দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র আজও সজীব রয়েছে।

তবে এই সজীব সহজতার মধ্যে অতীত ভারতের নিত্যদিন 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', অর্থাৎ 'ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে, অপরের ধনে লোভ করবে না'— এই জীবনমন্ত্র উদ্‌যাপন থেকে সরে আসার ফলে সামাজিক সমরসতা ও রাষ্ট্রীয় চেতনার অভাব ঘটেছে। ব্যক্তি থেকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি সর্বত্র ঈর্ষা, দ্বেষ, অহংকার, প্রতিযোগিতা, প্রতিহিংসা ইত্যাদি চারিত্রিক দোষ প্রকটভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ব্যক্তির পরিবর্তে 'গৈরিক ধ্বজ'-কে আপন গুরুর স্থলাভিষিক্ত করেছে। গৈরিক ধ্বজ চিরকালই ত্যাগ, তপস্যা আর সমর্পণের প্রতীক। রাত্রি অবসানে যেমন প্রভাত সূর্যের অরুণ কিরণ বিশ্ব ভুবনে ছড়িয়ে দেয় তার তরুণ প্রকাশ, স্বয়ংসেবকের গুরু গৈরিক ধ্বজও তেমনি পথ প্রদর্শনকারী হয়ে তার প্রাণে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালনের প্রেরণা জোগায়। গৈরিক ধ্বজ তাই রাষ্ট্রতত্ত্ব, আর গুরুপূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে স্বয়ংসেবকরা এই চিরন্তন প্রতিভূকে সমর্পিত চিত্তে পূজা, প্রণাম ও সমর্পণ করেন।

বর্ষা ঋতুর আগমন থেকে পরবর্তী চার মাস (চতুর্মাস্য) আবহাওয়ার দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট কালখণ্ড হিসেবে মান্য। না অত্যধিক গরম, না শীতের প্রকোপ। এই সময়কালকে অধ্যয়নের জন্যও উপযুক্ত বলে গণ্য। তপ্ত মাটিতে বর্ষার স্নিগ্ধ স্পর্শে যেমন নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়, তেমনই স্নিগ্ধ, শান্ত প্রকৃতির কোলে শ্রীগুরুচরণে উপস্থিত সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান অর্জনের ভক্তিযোগ সঞ্চারিত হয়। শাস্ত্রমতে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার বেদব্যাসের আবির্ভাব হয়। সেই কারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বিশেষ পবিত্র তিথিতে গুরুপূর্ণিমা পালনের প্রচলন রয়েছে।

ক্ষাত্রশক্তি, জ্ঞান ও ত্যাগের জীবন্ত প্রতীক ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনধারায় যজ্ঞের এক বিশেষ মহত্ত্ব আছে। যজ্ঞের বিবিধ অর্থ। সমষ্টিজীবনকে পরিপোষিত করার মানসে ব্যক্তিগত জীবন সমর্পণের প্রয়াসকেও যজ্ঞ বলা হয়। শ্রদ্ধাপূর্ণ, ত্যাগময়, সেবাব্রতী, তপস্বী জীবনযাপন করাও যজ্ঞ। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন অগ্নি। লেলিহান শিখা হলো সেই প্রজ্বলিত অগ্নির প্রতীকস্বরূপ— আর সেই লেলিহান শিখার প্রতীক হলো পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজ। রাষ্ট্রতত্ত্ব 'গৈরিক ধ্বজ' যদি বহ্নিশিখার প্রতীক হয়, সেই প্রতীকের পূজায় আত্মসমর্পণ তবে 'তত্ত্বপূজন'।

রাষ্ট্রতত্ত্ব পূজারির মনোবৃত্তিটি কিরূপ হবে? যেমন, 'তেল জ্বলে, প্রদীপের বাতি জ্বলে, লোকে বলে প্রদীপ জ্বলে'...তেমনই। যখন প্রদীপ জ্বলে, আমরা বলি দেখো প্রদীপ জ্বলছে, আসলে কিন্তু জ্বলছে প্রদীপের তেলটা, আর বাতিও জ্বলছে, সে যে তেলের জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছে।

প্রাচীনকালে মহর্ষি দধীচি যেমন সমাজের কল্যাণের জন্য, সমাজ সংরক্ষণের জন্য নিজের জীবনকে সমর্পিত করে দিয়েছিলেন, বাতিও তেমনি তেলের জীবন-উৎসর্গকারী উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করে দেয়। সমর্পণেই সাধনা, সমর্পণ লাগে, সাধনা-আরাধনা লাগে। অর্থের প্রয়োজন জীবনের জন্য, অর্থই জীবন নয়।

১৯২৫ সালে সঙ্ঘ শাখা শুরু হওয়ার পর প্রথম দুই বছর অর্থের আবশ্যকতার তেমন কোনো প্রয়োজন হয়নি। সাধারণ কার্যক্রম হতো, কার্যক্রমের স্বরূপ হতো সংক্ষিপ্ত, তাই খরচ-খরচাও তেমন বিশেষ কিছু হতো না। যদি কখনো বেশি অর্থের প্রয়োজন হতো, ডাক্তারজীর বন্ধু-বান্ধবরাই তা মিটিয়ে দিতেন। ডাক্তারজীর বন্ধুবর্গের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তিনি নিরপেক্ষ দেশসেবা করছেন। এদিকে ডাক্তারজী নিজেই খরচের হিসাব রাখতেন, এবার তিনি স্বয়ংসেবকদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। তাঁর দেখাদেখি স্বয়ংসেবকরাও অত্যন্ত সাধারণভাবে, কম খরচে কার্যক্রম করার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলেন। ইতিমধ্যে নাগপুরের পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ধা ও ভাণ্ডারা জেলায় নতুন শাখা শুরু হয়েছে, যে কারণে খরচও বেড়েছে বেশ। প্রথম দিকে ধার করে খরচ মেটানোর চেষ্টা হলো। কিন্তু স্বয়ংসেবকদের মনে আনন্দ নেই। শুরু হলো উপায় খোঁজা। তাঁরা বললেন, সঙ্ঘের যেমন শুদ্ধ কর্ম তার জন্য আমরা স্বয়ং অর্থের জোগান দিয়ে খরচের ব্যবস্থা কেন করবো না?

সকলের ভাবনা শোনার পর ডাক্তারজী বললেন, গুরুপূর্ণিমায় সমর্পণের পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। সেই থেকেই সঙ্ঘে গৈরিক ধ্বজের দিব্য স্বরূপের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করে গুরুদক্ষিণা সমর্পণের প্রথা প্রচলিত হয়েছে। গৈরিক ধ্বজের স্বরূপে রাষ্ট্রতত্ত্বের আরাধনার অর্থ হলো ত্যাগ ও সমর্পণের ঐশী গুণ নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা। সমুন্নত রাষ্ট্রের ধ্যেয় হৃদয়ে ধারণ করে সেবাভাবে রাষ্ট্রের হিতে নিরন্তর নিরলস সাধনা করে যাওয়া।

সম্পূর্ণ সমাজে এমন সমর্পণ ভাব জাগানোর জন্য সঙ্ঘে গুরুপূজনের পরম্পরা শুরু হলো। ব্যক্তির কাছে আপন শারীরিক, বৌদ্ধিক ও ধনশক্তি থাকে, সমাজের ভিতরে থেকে অর্জিত সেই সম্পদ ব্যক্তির নিজস্ব নয়, তার মালিক সমাজরূপী পরমেশ্বর। তাই নিজের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই নেওয়া, বাকি নিজের পরিবারের জন্য ব্যবহার করে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তা সমাজের জন্য সমর্পণ করে দেওয়া, সেই হলো সঠিক রাষ্ট্রপূজন। রাষ্ট্রায় স্বাহা— ইদং ন মম। যা কিছুই আছে, সবই সমাজের, রাষ্ট্রের হিতে ব্যবহার্য— কিছুই আমার নয়।

আমি ও আমার, এই অহং ভাবের বলবতী হওয়ার জন্যই আজ চারিদিকে সমস্ত রকম রাক্ষুসে প্রবৃত্তি— অহংকার, ঈর্ষা, পদের লোভ, স্বার্থের রেষারেষি অত্যধিক বেড়ে গেছে। এই সমস্ত আসুরিক শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য ত্যাগ, তপস্যা, সত্য, প্রেম ও করুণার মতো সদ্‌গুণ নিজের জীবনে নিয়ে আসাই হলো শিবসাধনা, গুরুপূজন। □

হিন্দু সমাজে প্রচলিত অগণিত ব্রত উৎসবের মধ্যে গুরুপূর্ণিমা স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গুরুপূর্ণিমা উৎসব আচরিত হয়। ঘটনাচক্রে এই তিথিতেই মহর্ষি বেদব্যাসের আবির্ভাব। বেদের শ্রেণীবিন্যাস, পুরাণ রচনা, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপদিষ্ট শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্কলন, বেদের জ্ঞানকাণ্ডের স্বরূপ নির্ণয়াত্মক ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি হিন্দু সমাজে দীর্ঘকাল সংরক্ষিত জ্ঞানপরম্পরাকে পুনর্ব্যবস্থিত করেছেন। পরবর্তীকালে গৌতম বুদ্ধ এই তিথিতেই সারনাথে শিষ্যদেরকে 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র' নামে প্রসিদ্ধ ধর্মোপদেশ প্রদান করেন।

সুপ্রাচীন হিন্দু সমাজের সমস্ত উন্নতির ভিত্তি ছিল সুব্যবস্থিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় আত্মনির্ভর গ্রামকুল এবং সমাজে সর্বজনীন, নিঃশুল্ক, সমাজোপযোগী ও জীবনোপযোগী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত। গুরুকুল ও তপোবনে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ যোগ্যতা অনুসারে যথাযথ শিক্ষা লাভ করত। গুরুকুল ও তপোবনগুলির আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সমস্ত ঐহিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সমাজ স্বস্কন্ধে ধারণ করেছিল। গুরুপূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে প্রত্যেক গৃহস্থ বা উপার্জনশীল ব্যক্তি নিজ গুরুকুলের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থভাবে দান করত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয়তার অভাবে এই পরম্পরা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু গুরুপূর্ণিমার মাহাত্ম্য কমেনি। হিন্দু সমাজে গুরুর গুরুত্ব প্রবল। যে কোনো বিদ্যা গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হলে তবেই সফল ও সার্থক হয়— এমনটাই হিন্দুদের বিশ্বাস। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ অবতারপুরুষও নিজেদের জীবন সাধনা গুরুর পথনির্দেশেই করেছেন এমনটাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য প্রমুখ ঋষিও নিজেদের জ্ঞানসাধনায় গুরুকেই পথিকৃৎ রূপে বরণ করেছেন। গুরু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপদেশকর্তা। নির্বানগত অর্থ— যিনি অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন তিনি। হিন্দু পরম্পরায় জ্ঞানকে অনাদি মনে করা হয়। জ্ঞানই সম্পূর্ণ জগতের প্রতিষ্ঠা।

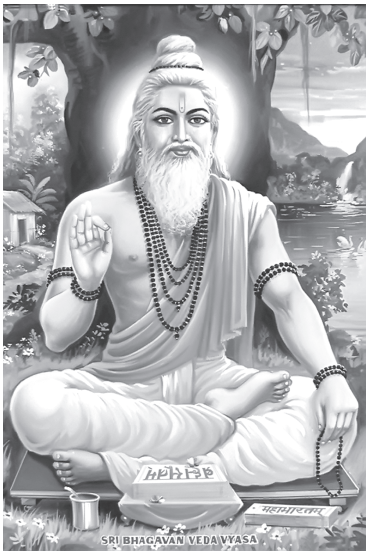

স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল
শ্রীগুরুপূর্ণিমা

ড. রাকেশ দাশ

মানব সভ্যতার যাত্রা হলো অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের উদ্দেশে অগ্রগমন। উপনিষদ বলেছে, সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম; সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত। সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের উপলব্ধিই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য। জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের বিস্মৃতিই বন্ধন। এই বিস্মৃতি বা অজ্ঞানরূপী বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে আবিষ্কার করার নামই মোক্ষ।

জ্ঞানযাত্রার গুরুত্ব আরোপের জন্য সংসারের ব্যাবহারিক যাপনকে হিন্দু সভ্যতায় অস্বীকার করা হয়নি। সেজন্য জ্ঞানপরম্পরাকে দুইটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে; মোক্ষসাধক পরা বিদ্যা এবং ব্যবহারিক উৎকর্ষের সাধক অপরা বিদ্যা। উপনিষদ বলেছেন, 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ'— দুইটি বিদ্যার অধ্যয়ন করতে হবে, পরা ও অপরা। এবং পূর্বোক্ত প্রকারে সমস্ত বিদ্যাই গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েই সার্থক হয়। সেজন্য জ্ঞানপরম্পরাতে গুরুর মাহাত্ম্য অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে এটাও প্রণিধানযোগ্য যে সমস্ত জ্ঞানপরম্পরাতেই— পরা কিংবা অপরা— পরমেশ্বরকেই প্রথম গুরু রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত যোগদর্শনের প্রথম পাদে মুক্তিলাভের উপায়ের মধ্যে একটি উপায় নির্দেশ করা হয়েছে— ঈশ্বরোপাসনা। প্রসঙ্গত, ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তিনি নিরতিশয় সর্বজ্ঞ; সমস্ত জ্ঞানের আধার। এবং 'স পূর্বেষাম্ অপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ' (যোগসূত্র ১/২৬)। তিনি পূর্ব-পূর্ব গুরুদেরও গুরু, কারণ, তিনি কালে পরিসীমিত নন। সৃষ্টির পরে যত ব্যক্তি জ্ঞান পরম্পরায় জ্ঞানোপদেশ করেছেন তাঁরা সকলেই কালের সীমায় আবদ্ধ। তাঁরা প্রত্যেকেই মরণধর্মা। অথচ জ্ঞানপরম্পরা নিত্য প্রবহমান। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে, ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসের পরেও জ্ঞান বিদ্যমান। সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা কালে আবদ্ধ নন। সেজন্যই তিনি সমস্ত গুরুরই গুরু। সেই সর্বজ্ঞ, সর্বাতিশায়ী শক্তির আধার, সমস্ত জ্ঞানের উপদেষ্টা পরমেশ্বরই নানা নাম ও রূপে নিজেকে বিকশিত করে দৃশ্যমান সৃষ্টি রূপে প্রকট হয়েছেন। সৃষ্টির প্রতি কণায় তিনি নিত্য বিরাজমান। এই সত্যের অন্বেষণই সাধনা।

জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই নিজেকে জগৎরূপে বিকশিত করে তাতে ওতপ্রোত; সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সৃষ্টির নামরূপাত্মক স্বরূপটি অনিত্য, সারভূত পরমাত্মাই নিত্য; ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা। (মিথ্যা শব্দের অর্থ অনিত্য)

আমি সহ এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিই তাঁরই অংশমাত্র— জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। এই সৃষ্টিতে সমস্তই এক সূত্রে গাঁথা। সকলেই একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সর্বত্র এক চেতনের বিস্তার। সৃষ্টির একাত্মতার বোধ জাগ্রত করাই আমাদের জীবনলক্ষ্য। গুরু সেই লক্ষ্য পূরণে আমাদের সহায়ক হন। গুরুর মাধ্যমেই পরমেশ্বর আমাদেরকে সেই বোধে উন্নীত করেন। তিনিই আমাদের শক্তির উৎস, তিনিই আমাদের মার্গদর্শক; এই ধারণার চিন্তন-মননের মাধ্যমে সমস্ত নৈরাশ্য ও অবসাদকে জীর্ণ করে নিজেদের আদর্শের প্রতি সমর্পণের ভাবনাকে সুদৃঢ় করে নতুন উৎসাহে হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রোথিত একাত্মতার ভাবনাকে সমগ্র জগতে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজকে নতুন গতি প্রদান করি আমরা। □

ফঃ ৫

বাস্তুঘুঘু আমলাতন্ত্রের থেকে সাবধান থাকতে হবে নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে

দেববানী ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ন্যায্য স্থান অধিকার করার দুই মাস মাত্র অতিক্রান্ত হওয়ার সপ্তাহ খানেক আগেই রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে নাবালিকা ও নাবালক হত্যার রাজনীতি। যদিও হত্যার ঘটনাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত অপরাধকর্ম অপেক্ষা রাজনৈতিক হত্যা বলেই অধিক প্রতীয়মান হয়েছে, তথাপি এ লেখা সেই সকল হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত নয়। পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত রাজনৈতিক দলটির সামনে সুবর্ণ সুযোগ সমুপস্থিত এরাজ্যের হত্যার রাজনীতির ক্ষ্যাপা ষাঁড়কে শিং ধরে মোচড় দেওয়ার, কিন্তু তা করতে দলটি পারবে কিনা তা নির্ভর করছে মূলত যে সকল বিষয়গুলির ওপর— এই লেখা সেই প্রকার একখানি বিষয়ভিত্তিক।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক সমস্যাসঙ্কুল ও রোগাক্রান্ত স্থানটি যে এরাজ্যের অর্থব্যবস্থা, দেশে ও বিদেশে বসবাসরত কয়েকজন প্রথিতযশা বাঙ্গালি অর্থনীতিবিদ ব্যতীত সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার মতো মানুষ বুঝি-বা আর কেউ নেই।

এ দাবির সত্যতা উপলব্ধি করতে হলে স্মরণ করা আবশ্যক যে গত ৫ বছর যাবৎ কোনো পূর্ণমন্ত্রী এ রাজ্যের অর্থ দপ্তরে ছিলেন না। ছিলেন একজন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য,অতি সম্প্রতি যাকে বলতে শোনা গিয়েছে যে এ বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে, ফেব্রুয়ারি মাসে, রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করার ঘণ্টা দুয়েক মাত্র আগে বাজেট পত্রকটি এসেছিল তার হাতে। তার আগে বাজেট ঠিক কী প্রকার হতে চলেছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নাকি তার ছিল না।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্যের এহেন দাবিকে খতিয়ে দেখা আবশ্যক। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ মাত্রই অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ডঃ অমিত মিত্রের নিঃশব্দ প্রস্থানের ঘটনাটির প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ছিল যে ২০২১-এর নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়ের পর অমিত মিত্র নীরবে কেন সরে গিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে? নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে তাঁর দায়িত্ব যেখানে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল?

তার কয়েক মাস পর ২০২১-এর নভেম্বর থেকে অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন চন্দ্রিমা দেবী। অর্থাৎ দপ্তর সামলাতে অর্থ দপ্তরের আমলাদের হয়তো বা প্রয়োজন ছিল এমন একজন মন্ত্রীর যিনি শুধুমাত্র করবেন একখানি সই ও দেবেন একখানি স্ট্যাম্প যার জন্য অমিত মিত্র মহাশয়ের মতো অর্থনীতিবিদের প্রয়োজন ছিল না।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের এহেন বক্তব্যের সারবত্তা এ থেকেও পাওয়া যায় যে, ফেব্রুয়ারি মাসের অন্তর্বর্তী বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের জন্য চার শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা ঘোষণা করেছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। কিন্তু অর্থ দপ্তর সেই সংক্রান্ত কোনো নোটিফিকেশন জারি না করার ফলে ২০২৬-এর এপ্রিল মাস থেকে প্রাপ্তব্য সেই চার শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীরা আজও পাননি।

এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দপ্তর পরিচালনা করে এসেছেন মূলত এক শ্রেণীর আমলারাই। মন্ত্রীর ঘোষণা যাই-ই হোক, আমলার নোটিফিকেশন ব্যতীত সে ঘোষণা প্রশাসনিক ও আইনগতভাবে অকার্যকর। নবান্নের অলিন্দে কান পাতলে শোনা গিয়েছে একথাও যে, অর্থমন্ত্রী থাকাকালীনও নাকি অর্থদপ্তরের রাশ অমিত মিত্রের হাতে ছিল না। বাবুরা বাজেট বানাতেন বন্ধ ঘরে বসে যে ঘরে মিত্রমশাই চাইলে মারতে পারতেন কেবলমাত্র উঁকিঝুকই। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পুরোপুরি ছিল আমলাদের হস্তগত, ফলে দুর্নীতিও হয়েছে সীমাহীন, দিগন্তহীন, অতল, অনন্ত। এমনই মাত্রায় যে, কোনো কোনো আইএএস অফিসার তার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে বহু তদ্বির তদারকি করে রাজ্য ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন অন্য রাজ্যে বা কেন্দ্রের অন্য পোস্টিংে। একজন ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের আইএএস সেই যে পালিয়েছিলেন মুসৌরীর আইএএস ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিঙের দায়িত্ব নিয়ে, আর এমুখো হয়নি।

এরাজ্যের পুকুরচুরির বাস্তুঘুঘুদের বৃহত্তম অংশই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের আর অর্থদপ্তরের আমলাদের এই অনর্থকারী ঘুঘুর বাসাটিকে ভাঙ্গা তো দূর, ছুঁতে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত মহাশয় এতদবধি পেরে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য রাজ্যের সবচেয়ে কঠিন কাজটি দু'মাসের মধ্যেই করে ফেলা যাবে, এমন আশাও বাতুলতাই। উপরন্তু অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের যেখানে প্রশাসন পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে বলে জানা নেই। সেই কারণেই বুঝি গত ২২ জুন পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের জন্য অক্টোবর ২০২৬ থেকে প্রাপ্তব্য যে কুড়ি শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, তার নোটিফিকেশনও আজও পর্যন্ত জারি করেননি অর্থ দপ্তরের বাস্তুঘুঘুরা। বার্তা স্পষ্ট। অর্থ দপ্তরের ক্ষমতা থাকবে আমলাদের হাতে, কোনো মন্ত্রীর হাতে নয়।

রাজ্যের অর্থদপ্তরের আমলাদের এহেন অসাংবিধানিক কার্যকলাপের গোপনীয়তা রক্ষার্থেই বুঝি বা পাবলিক অ্যাকাউন্টস্

কমিটির চেয়ারম্যানের পদে ২০১৬-র রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বসতে দেওয়া হয়নি কোনো বিরোধী বিধায়ককেই। ২০১৬-র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যানের পদটির জন্য বাম-কংগ্রেস বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে নির্বাচন করা হয়েছিল কংগ্রেস নেতা মানস ভুঁইঞাকে, যার অব্যবহিত পরেই মানস ভুঁইঞা যোগদান করেন তৃণমূলে।

একই প্রকার ঘটনা ঘটে ২০২১-এর নির্বাচনের পরেও। ৭৭টি আসনে বিজেপির জয়লাভের পর পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যানের পদে বিজেপির পক্ষ থেকে কে বসবেন তা বিজেপির পরিষদীয় দলকে ঠিক করতে না দিয়ে বিধানসভার স্পিকার নিজে নিজেই মনোনীত করে বসেন মুকুল রায়কে এবং মুকুল রায়ও তারপর পুনর্যোগদান করেন তৃণমূলে। স্পিকারের এহেন সিদ্ধান্ত আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। কিন্তু একই চিত্রনাট্যের পুনরাবৃত্তি হয় তার ক্ষেত্রেও এবং কৃষ্ণ কল্যাণীকেও যোগদান করতে হয় তৃণমূলে।

এহেন সকল কুনাট্যের আদত কারণ রাজ্যের অর্থদপ্তরের কার্যকলাপ ও পুকুরচুরির গল্প বিরোধী দলের কাছ থেকে গোপন রাখা ভিন্ন অন্য কিছু হওয়া প্রায় অসম্ভব। রাজ্যের অর্থব্যবস্থার হালহকিকত স্পষ্টভাবে জানতে পারেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান, কারণ রাজ্যের বুকস্ অফ অ্যাকাউন্টস্ দেখার অধিকার তাঁর সংবিধানস্বীকৃত অধিকার। কিন্তু গত ১৫ বছরে এরাজ্যের হিসাবের বহি-খাতা দেখতে দেওয়া হয়নি কোনো বিরোধী দলকেই। এমনকী তৃণমূলের পক্ষ থেকেও কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি মন্ত্রী হিসেবে অর্থ দপ্তরকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পেয়েছেন বলে মনে হয়নি, বরং অর্থ দপ্তর চলেছে একদল আমলার খেয়ালখুশিতেই। আর সেই কারণেই বুঝি ২০২১ সালের সিএজি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত কালখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা ব্যয়িত অর্থের দু'লক্ষ উনত্রিশ হাজার কোটি টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়ে উঠতে রাজ্য সরকার পারেনি। তারপর প্রকাশিত হয়েছে ২০২২, '২৩, '২৪-এরও সিএজি রিপোর্ট— যেগুলিতেও রয়েছে এমন সমস্ত বেনিয়মের চিহ্নিতকরণ, যার ফলে উপরোক্ত রিপোর্টগুলিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পেশ করাই হয়নি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। রাজ্যের আমলাতন্ত্রই কি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পেশ করার পথে?

প্রকাশিত হয়েছে ২০২২, '২৩, '২৪-এরও সিএজি রিপোর্ট— যেগুলিতেও রয়েছে এমন সমস্ত বেনিয়মের চিহ্নিতকরণ, যার ফলে উপরোক্ত রিপোর্টগুলিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পেশ করাই হয়নি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। রাজ্যের আমলাতন্ত্রই কি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পেশ করার পথে?

আমলাতন্ত্রের দ্বারা গণতন্ত্রের এই প্রকার হাইজ্যাকিঙের উদাহরণ অবশ্য বর্তমান পৃথিবীতে অন্যত্রও আছে। ২০১৮ সালে 'জার্নাল অব ডেমোক্রেসি'তে প্রকাশিত জার্মান আমেরিকান পলিটিকাল সায়েন্টিস্ট, শিক্ষাবিদ ও লেখক য়াশা বেঞ্জামিন মওঙ্ক-এর এক প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে, "One crucial factor narrowing the sphere of democratic contestation has been the growing role of state bureaucracies– which have taken ever more issues under their jurisdiction. Indeed– government agencies have not only grown more influential in designing the laws passed by parliaments over the past decades— at the same time– they themselves have also increasingly assumed the role of quasi-legislators.

A traditional bureaucratic body is charged with implementing legislation drawn up by the legislature and is led by a politician—often an elected member of parliament—who has been appointed by the president or prime minister. But in a growing number of policy areas– elected legislators have been supplanted as the key decision makers by 'independent agencies' with the authority to formulate policy– entities that are remarkably free from oversight either by the legislature or by the elected head of government." য়াশা মওঙ্ক হলেন আমেরিকার জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্র্যাকটিস্ অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স' বিষয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর।

বামফ্রন্ট অথবা তৃণমূলি শাসনের অন্তরালে 'আমলাতন্ত্র' হলো এরাজ্যের সবচেয়ে বড়ো শোষক বা এক্সপ্লয়টার। আমলাতন্ত্রের ভ্রষ্টাচারী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার উদাহরণ হাতের কাছে দেখতে পাওয়া যায় বাংলাদেশেও। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারের পতনের পশ্চাতে সে দেশের আমলাতন্ত্রের ভূমিকার কথা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরে সচেতন মানুষদের মধ্যে বর্তমানে প্রায় সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্ষেত্রেও নানাবিধ অসংখ্য দুর্নীতির মধ্যে ভয়ঙ্করতম হলো সেগুলি যেগুলির ফলে পাবলিক ট্রেজারির ব্যয়িত অর্থের হিসাব প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্যের অর্থদপ্তর। এহেন দুর্নীতির প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবনে কী ও কতখানি, সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে গেলে সংশ্লিষ্ট সিএজি রিপোর্টগুলি ও রাজ্যের অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি শ্বেতপত্র অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্তর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়া অপরিহার্য। ডঃ দাশগুপ্ত'র বক্তব্য অনুযায়ী এমন পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনাও ভারতীয় জনতা পার্টির আছে যা বিগত দুই মাসে হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সিএজি রিপোর্ট সমূহ ও শ্বেতপত্রটি প্রকাশিত হোক এবং আমলা-পরিচালিত সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উপর থেকে পর্দা চিরতরে সরে যাক— রাজ্যের অর্থ দপ্তরের বাস্তুঘুঘুরা কি তা চাইবেন?

সেই কারণেই কি 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র

মতো সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের রূপায়ণে মহা বিভ্রান্তিকর এক গোলযোগ সৃষ্টির কৌশল তারা গ্রহণ করেছেন? বার্তাটি কি এই যে, সিএজি রিপোর্ট বা আর্থিক তছরুপের পর্দা ফাঁস করতে গেলেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিপাকে ফেলবেন আমলাসামন্তরা? সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণে দেখা দেবে গোলযোগ এবং তজ্জনিত গণবিক্ষোভের আঁচ এসে পড়বে নির্বাচিত লেজিসলেচারের উপর? এ প্রসঙ্গে এ-ও লক্ষণীয় যে, অক্টোবর মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের ২০ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা বৃদ্ধির যে ঘোষণা অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত তাঁর বাজেট বক্তৃতায় করেছেন, তার নোটিফিকেশনও এতদবধি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয়নি, ঠিক যে প্রকারে অর্থদপ্তরের পূর্বতন রাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দ্বারা ঘোষিত এপ্রিল মাস থেকে প্রাপ্তব্য ৪ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতার নোটিফিকেশনটিও অপ্রকাশিত ছিল। আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কার্যকে প্রতিহত করার প্রয়াসই করছে, তা উপলব্ধি করতে সামান্য ধীমান মানুষেরও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

বিস্মিত হওয়ার মতো বিষয়ের পরিধি অবশ্য এই মাত্রই নয়। গত ৯ মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার নতুন ক্যাবিনেটের শপথগ্রহণের তিন দিন পরেই নবান্নে কর্মরত ২৩২ জন অবসরপ্রাপ্ত তথা এক্সটেনশনে কর্মরত আমলার এক্সটেনশন নিযুক্তি রদ করে নবনির্বাচিত রাজ্য মন্ত্রীসভা। ১২ মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পার্সোনেল ও প্রশাসনিক দপ্তরের জেনারেল সেল-এর 761-PAR(Genl.)/HR/N/G8P-04/ 2025 নম্বর নোটিফিকেশন অনুযায়ী রদ হয় ২৩২ জনের এহেন এক্সটেনশন নিয়োগ। এই ২৩২ জনের মধ্যে ৬৯ জনই ছিলেন অর্থদপ্তরের। অর্থাৎ কিনা এক্সটেনশন নিয়োগের ৩০ শতাংশই ছিল রাজ্যের অর্থদপ্তরে।

এত বছর ধরে এরাজ্যের অর্থদপ্তরে নতুন কোনো আমলাকে প্রবেশ করতে দিতে না চাওয়ার এইটি একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশক বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত। নচেৎ এত অধিক সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত আমলার এক্সটেনশন নিয়োগের পরিবর্তে নতুন আমলাবর্গের হাতে দায়িত্ব দিলে অর্থ দপ্তরের কাজে আসতে পারত নতুন গতি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন আইডিয়াও। কিন্তু অর্থদপ্তরের বাস্তুঘুঘুরা নিশ্চিতভাবেই তা চাননি।

এরপর গত ২২ জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারের বাজেট পেশ হওয়ার পরেও দেখা গেল যে, এই বাজেট প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করেছেন যারা, তাদের মধ্যেও রয়ে গিয়েছেন অর্থদপ্তরের সেই অবসরপ্রাপ্ত বাস্তুঘুঘুরাই যাদের নাম দৃষ্ট হয় অর্থ দপ্তরের আমলা-তালিকার একেবারে শীর্ষে, দুই, তিন বা চার, পাঁচ নম্বরে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ছোটগল্পের সংজ্ঞা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের অর্থদপ্তরে এই ঘুঘুদের জীবনও বুঝি কিঞ্চিৎ সেই প্রকার। অর্থাৎ— 'শেষ হইয়াও না হইল শেষ!' অর্থাৎ খাতায়-কলমে চাকরি যাওয়া সত্ত্বেও অর্থ দপ্তরের মৌরসীপাট্টাটি তাদের হাতে রয়েই গেল। ফলে বাজেট মিটিঙের দিনের শেষে ফোটোগ্রাফে তারা দৃষ্ট হলেন মুখ্যসচিবের গা ঘেঁসে এবং মুখ্যমন্ত্রীর যথাসম্ভব নিকটস্থ হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায়।

এরাই যদি পরিচালনা করে চলেন রাজ্যের অর্থদপ্তরকে, তবে রাজ্যের নীতিনির্ধারণী ক্ষমতার হস্তান্তর হয়নি বলেই ধরতে হবে এবং নিজ ভাবমূর্তি রক্ষার্থে বিজেপির জনপ্রতিনিধিদেরকে অনবরতই চলতে হবে এদের মন জুগিয়ে।

অর্থাৎ এরাজ্যে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ও সামন্তরাজত্বের চাবিকাঠিটি শাসনব্যবস্থার ঠিক কোন স্তরে তা স্পষ্ট বোধগম্য হয় এ থেকেই যে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীবৃন্দ নয়, পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতার রাশ ছিল ও অদ্যাবধি রয়ে গিয়েছে একদল আমলার হাতে যাদের মধ্যে অর্থদপ্তরের আমলাবৃন্দই মুখ্য। পশ্চিমবঙ্গের জনকোষের (পাবলিক অ্যাকাউন্ট) বিপুল তছরুপের দায় অর্থ দপ্তরের এই বাস্তুঘুঘুরা ব্যতীত আর কার?

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন লেজিসলেচারের জন্য ১২ মে-র নোটিফিকেশন দ্বারা ইতিমধ্যেই চাকরি থেকে বহিষ্কৃত অর্থদপ্তরের ওই ৬৯ জন অবসরপ্রাপ্ত আমলার নবান্নে পুনঃপ্রবেশ যে কোনো মূল্যে যে কোনো পরিস্থিতিতে বন্ধ করা অপরিহার্য। নচেৎ 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র রূপায়ণের ক্ষেত্রে সৃষ্ট গোলযোগের মতোঅপরাপর নিত্যনতুন প্রশাসনিক গোলযোগ যে চলতেই থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এরাজ্যের অর্থদপ্তরের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস সে সাক্ষ্যই দেয়। অবসরের পরেও নবান্নে অবাধ প্রবেশের অনুমোদন তাদের থাকতে পারে না।

২০২৫-এর ২০ মার্চ তারিখে প্রকাশিত অর্থদপ্তরের এক নোটিফিকেশনে (No. 118/ FA/O/RTI-64/18) যে আমলা-তালিকা প্রদত্ত হয়েছিল, তার সাত নম্বরে নাম ছিল এমনই একজন প্রোমোটি আইএএস অফিসারের। উপরোক্ত নোটিফিকেশন অনুযায়ী তার দায়িত্ব তথা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল গ্রুপ-সি, মেডিক্যাল সেল, সার্ভিস রেকর্ড অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস্ সেল, রেভিনিউ মবিলাইজেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, জিএসটি, রাজ্যের হেল্‌থ্ সার্ভিস প্রোভাইডারদের এবং ডিরেক্টর অব লটারির দায়িত্ব। এক কথায় বলতে গেলে রাজ্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক দায়িত্বগুলি একত্রিতভাবে ন্যস্ত হয়েছিল একজনই আমলার উপর যা কিনা দায়িত্ব তথা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের নির্দেশক। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের সর্বাধিক গুরুতর সাত-আটখানি কার্যভার একজন ব্যক্তির উপর চাপানোর উদ্দেশ্য কখনোই প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি হতে পারে না। অর্থাৎ যৌক্তিকতার নিরিখে এই আমলাকে নবান্নের একজন 'বাস্তুঘুঘু' হিসেবে ধরে নেওয়া ভুল নয়।

রাজ্যের হেল্‌থ্ সার্ভিস প্রোভাইডারদের দায়িত্বটিও এর উপরে থাকার কারণে অর্থ দপ্তরের কর্তা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের দুর্নীতি সম্পর্কেও ইনি সম্যক অবহিত একথাও ধরে নেওয়া চলে। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, এই আমলার উপরেই ন্যস্ত ছিল আমফান দুর্যোগের সময়কার রিলিফ ফান্ডের দায়িত্বও এবং সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী আমফান রিলিফ ফান্ডের সিএজি অডিট

রিপোর্টে পাওয়া গিয়েছিল--- ‘ভেরি লার্জ নাম্বার অফ ইরেগুলারিটিজ’। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট এই আমলার কর্মদক্ষতা প্রশ্নাতীত না হওয়া সত্ত্বেও এবং ব্যক্তিগত স্তরে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বাতাসে ভেসে বেড়ানো সত্ত্বেও ২০২৫ সালে তার উপরেই ন্যস্ত ছিল অর্থদপ্তরের সাত-আটটি দায়িত্বের গুরুভার এবং এখনও তিনি বিরাজ করছেন স্টেট জিএসটি, এক্সাইজ, ভ্যাট ও অন্যান্য অনুরূপ স্টেট ট্যাক্স দপ্তরগুলির অন্যতম কমিশনার হিসেবে। অর্থাৎ সেই দপ্তর যে দপ্তর সংগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব-ধন। এদিকে দৃষ্টিপাত করা বিজেপি লেজিসলেচারের পক্ষে অনিবার্য কারণ স্টেট জিএসটি সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিপুল জনসংখ্যার রাজ্য ‘পশ্চিমবঙ্গ’-এর যা কৃতিত্ব হওয়া উচিত তার অংশমাত্রও রাজ্যটির নেই। অথচ উপযুক্ত রাজস্ব আদায় বিনা রাজ্যের জনকোষের হাল ফেরানো যে অসম্ভব— শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই তা বুঝবেন।

অন্যদিকে, ২০১৭-য় ‘জিএসটি’ চালু হওয়ার পর থেকে রাজ্যের অর্থ দপ্তরের আমলারা রাজ্যে জিএসটি সংগ্রহের উদ্যোগ না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন শিল্পপতিদেরকে ‘বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট’-এ নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করতে। এর ফলে রাজ্যে শিল্পাগম না হলেও অর্থ দপ্তরের আমলারা তথা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারবর্গ কোনো প্রকারে লাভবান হয়েছিলেন কিনা সেই সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করা এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যক বলে বোধ হয়। জনকোষ (গণতন্ত্রে রাজকোষই ‘জনকোষ’) থেকে পুকুর চুরির পেছনে এই বাস্তুঘুঘুদের ভূমিকা তদন্তের আওতায় না আনলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে বাজেটে ‘সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা’ খাতে বরাদ্দ হয়েছিল ৫৬০০ কোটিরও বেশি টাকা, সেই বাজেট তৈরি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দপ্তরের যে আমলারা, সেই আমলাদের দিয়ে রাজ্য প্রশাসন চালালে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতি দূর হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়েই রয়ে যাবে কারণ অর্থ দপ্তরের আমলারা যে এক অর্থে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে করে রেখেছে পণবন্দি, সে সত্য উপলব্ধি করার উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত।

কেবলমাত্র ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র রূপায়ণে গোলযোগ ঘটানো বা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ২০ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতার নোটিফিকেশন জারি না করাই নয়, এরাজ্যে বিজেপি পরিচালিত নতুন সরকার এখনও গঠন করে উঠতে পারেনি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য নতুন পে কমিশনও। যদিও ক্ষমতায় এলেই ‘বেতন কমিশন’ গঠন করার ঘোষণাটি ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী সংকল্পপত্রের অঙ্গ।

উপরন্তু, রাজ্য বাজেটের আগে সে বিষয়ে ক্যাবিনেটের অনুমতিও যে মিলেছে সেই বিবৃতিও এসেছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের কাছ থেকেই। তথাপি সে কমিশনের গঠন যে অদ্যাবধি হয়নি তৎপশ্চাতে কারণ— নবান্নের অর্থ দপ্তরের বাস্তুঘুঘুদের স্বার্থান্বেষী মস্তিষ্কসঞ্চালন হওয়াই সম্ভাব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘পে কমিশন’ গঠন প্রক্রিয়ায় ক্যাবিনেটের অনুমতি লাভের পর তা ঘোষণা করার দায়িত্ব অর্থ দপ্তরেরই, যে কাজ গত দেড় মাসের মধ্যে করে উঠতে অর্থ দপ্তর পারেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাধারণ কর্মচারীবৃন্দকে উপযুক্ত বেতন (নিজেদের পে-স্কেলের অনুপাতে) পেতে না দিয়ে বেআইনি আর্থিক অসাম্য বজায় রাখা এবং তার মাধ্যমে সাধারণ কর্মচারীকে দুর্নীতিপ্রবণ ও মেরুদণ্ডহীন করে রাখাই এর পশ্চাতে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের আদত উদ্দেশ্য বলে প্রতীত হয়।

যে ২৩২ জন অবসরপ্রাপ্ত এক্সটেনশনপ্রাপ্ত আমলার চাকরি গিয়েছে, তাদের ৬৯ জন যেমন অর্থদপ্তরের, তেমনই ৫২ জন ছিলেন ‘হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স’ দপ্তরের। নিজেদের পুকুর চুরির সত্য ঢাকতে অর্থ দপ্তরের বাস্তুঘুঘুরা যদি তাদের হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের সহকর্মীদের সহায়তা নিয়ে রাজ্যে সৃষ্টি করতে চায় কোনো অরাজক পরিস্থিতি, তবে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কারণ নেই।

সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গেল পানিহাটির বিধায়িকা রত্না দেবনাথের স্বামীর উপর চুরির অপবাদ দেওয়ার মরিয়া প্রয়াস। অতঃপর ঘটল বারুইপুরে নাবালিকা হত্যা, মব লিঞ্চিং, উগ্র পথ-প্রতিবাদের নামে রেলপথ ও রাজপথের মতো জন-সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনা এবং ঘটল নাবালক হত্যারও ঘটনা ও আরও একাধিক হত্যার ঘটনা। এসব ঘটনায় নবনির্বাচিত বিধায়ক ও মন্ত্রীদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখলে অর্থ দপ্তরের সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করতে তাঁরা পারবেন না এমন ভাবনাই যদি এই প্রকার অরাজকতা সৃষ্টির পশ্চাদবর্তী চালিকাশক্তি হয়ে থাকে তবে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে অর্থদপ্তরের কার্যালয়ে।

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেখানকার এবং রাজ্যের হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের বাস্তুঘুঘুরা একদা ছিলেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএম কার্যালয়ের নিত্য তল্পিবাহক। ফলে আজও যদি রাজ্যের বৃহত্তর বাম শক্তি এই আমলাদেরই সহায়তায় পাকাতে থাকে বিজেপি-বিরোধী ঘোঁট এবং প্রতিরোধ করতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বিকাশের জাতীয়তাবাদী উদ্যোগকে, তবে তা বিস্ময়কর নয়। পশ্চিমবঙ্গের আমলাতন্ত্রের এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশ যে বৈদেশিক শক্তি গ্লোবাল ডিপ স্টেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের ধারাবাহিক কার্যকলাপ থেকে সে বিষয়ে সন্দেহ না করার সুযোগ নিতান্ত কম। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

উপমন্যুর গুরুভক্তি

ঋষি ধৌমের প্রিয়শিষ্য উপমন্যু। তার গুরুভক্তির পরীক্ষার জন্য গুরু তাকে গোরু চরানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। দিনের শেষে গোরুগুলি নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলে গুরু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস, তোমাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, তুমি মাঠে কী খাও?

উপমন্যু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, প্রভু আমি ভিক্ষায় যা পাই তাই খাই। গুরু বললেন, পুত্র, ভিক্ষান্ন গুরুকে নিবেদন করতে হয়। উপমন্যু যথা আজ্ঞা বলে স্থান ত্যাগ করল।

কিছুদিন পর গুরুদেব আবার উপমন্যুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো ভিক্ষান্ন গুরুকে নিবেদন করছো , তাহলে তুমি কী খাও? উপমন্যু উত্তর দিল, প্রথমবার ভিক্ষা করে যা পেয়েছিলাম,তা গুরুকে নিবেদন করার পর দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করে তা গ্রহণ করেছি। গুরু বললেন, বৎস, আশ্রমিকদের জন্য এই আচরণ অনুচিত। এমনটি আর করবে না। উপমন্যু যথা আজ্ঞা বলে স্থান ত্যাগ করল।

কিছুদিন পর গুরুদেব আবার তাকে জিজ্ঞেস করেলন যে, কিছু খেতে বারণ করা সত্ত্বেও সে কীভাবে শরীর ঠিক রেখেছে। উত্তরে উপমন্যু বলল, সে প্রতিদিন দুপুরে সামান্য গোদুগ্ধ পান করে। গুরু এমনটি করতেও নিষেধ করলেন।

কিছুদিন পর উপমন্যুকে বেশ সুস্থ দেখে গুরু জিজ্ঞেস করলেন , এখনোও তোমাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্ছে, কী খাও তুমি? উপমন্যু বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, বাছুরেরা গাভীর দুধ খাওয়ার পর তাদের মুখে যে ফেনা লেগে থাকে, তাই সে পান করে। গুরুদেব বললেন, এতে বাছুরদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। এরকম আর করবে না। উপমন্যু এতেও রাজি হলো।

পরদিন অপরাহ্নে উপমন্যু প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লো। আর সহ্য করতে না পেরে সে আকন্দগাছের পাতা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। আকন্দপাতার বিষাক্ত রসের প্রভাবে উপমন্যু তৎক্ষণাৎ অন্ধ হয়ে গেল। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে একটি পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

সূর্যাস্তের পর উপমন্যু আশ্রমে না ফিরলে গুরুদেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে তিনি উপমন্যুকে খুঁজতে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাকে একটি পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে সবাই মিলে তুলে নিয়ে আশ্রমে এলেন। তার মুখ থেকে সব কথা শোনার পর গুরুদেব অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়কে আহ্বান করলেন। অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় উপমন্যুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন।

উপমন্যুর গুরুভক্তিতে গুরুদেব খুব প্রসন্ন হলেন। তিনি তাকে আশীর্বাদ করলেন যে, সমস্ত জ্ঞান তার অধিগত হবে। পরবর্তীকালে উপমন্যু গুরুকৃপায় মহর্ষি হয়েছিলেন। শিবপুরাণ অনুসারে মহর্ষি উপমন্যুই শ্রীকৃষ্ণকে শিবের মাহাত্ম্য ও উপাসনাপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

রানি ঝাঁসি মেরিন

রানি ঝাঁসি মেরিন ন্যাশনাল পার্ক আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রিচি দ্বীপে অবস্থিত। ১৯৯৬ সালে এই উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২৫৬ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এই উদ্যান। এই উদ্যানে রয়েছে ম্যানগ্রোভ, প্রবাল প্রাচীর, ল্যাগুন এবং চিরহরিৎ রেইনফরেস্ট। রয়েছে ডুগং, সামুদ্রিক কচ্ছপ, কুমির এবং নানাজাতের রঙিন মাছ। এই উদ্যানের অরণ্যে ফলভোজী বাদুড়, চিত্রা হরিণ, ধনেশ পাখি প্রভৃতি রয়েছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে নৌকা বা ফেরি যোগে এই দ্বীপে যাওয়া যায়। নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে শুষ্ক ও মনোরম আবহাওয়ায় এই দ্বীপ ভ্রমণের উপযুক্ত সময়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২১

भविष्यत् कालः – उत्तमपुरुषे
पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च समानम्
गच्छामि – गमिष्यामि (যাই–যাবো)
पठामि – पठिष्यामि।
लिखामि – लेखिष्यामि।
वदामि – वदिष्यामि।
ददामि – दास्यामि।
अहं गृहं गमिष्यामि (पुं)
अहं गृहं गमिष्यामि (स्त्री)
अहं पुस्तकं पठिष्यामि।
अहं जलं पास्यामि।
अहं गृहम् आगमिष्यामि।
अहं उत्थास्यामि।
अहं गीतं गास्यामि।
(এরকমভাবে বাক্য রচনা করতে হবে)

ভালো কথা

রথযাত্রা

আমাদের জালালপুরের রথযাত্রা অনেক বছরের পুরনো। আমার জন্মের আগেই সরকার থেকে এই রথযাত্রা বন্ধ করে দিয়েছিল। এবার সরকার অনুমতি দেওয়ায় খুব ধুমধাম করে করে রথযাত্রা হয়েছে। ৫০ ফুট উঁচু লোহার রথ। হাজার মানুষ এসেছিল। এই মেলা নয়দিন ধরে চলবে। আমরা বন্ধুরা মিলে একটি ছোটো কাঠের রথ বানিয়ে মেলায় ঘুরেছি। বিকেলে জিলিপি আর পাঁপড়ভাজা খেয়ে বাড়ি এসেছি। আমরা ন'দিন ধরেই মেলায় আমাদের ছোটো রথ নিয়ে ঘুরতে যাব। বাবা বললেন, আর জালালপুরের রথ কোনোদিন বন্ধ হবে না।

রাজেশ সাহা, সপ্তমশ্রেণী, যদুপুর, কালিয়াচক, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) থা রি ত চ

(২) ক ড়ি র গা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) রি হ ন ত্র চ ন

(২) ল ণ চ ক র ম

১৩ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) হাস্যকৌতুক (২) সুবিধাবাদী

১৩ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) বিচারবিবেচনা (২) বিনোদনমূলক

(১) কৃতিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (২) শ্রেয়ান রুইদাস, শ্যামপুর, হাওড়া।
(৩) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল- ৭০। (৪) কুহেলী বিশ্বাস, কালীবাড়ি, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

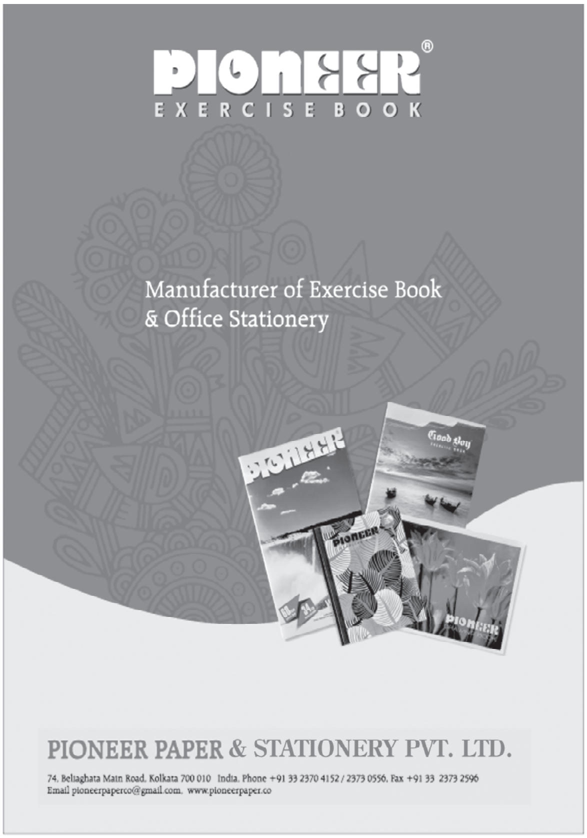

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

জগদ্‌গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

গোপাল চক্রবর্তী

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম তিথি (আষাঢ়ী পূর্ণিমা) গুরুপূর্ণিমা। আসমুদ্রহিমাচলে এই দিন গুরুপূর্ণিমা পালিত হয়। ব্যাসদেবের জন্ম যেমন রহস্যে ভরা তেমনি তাঁর কর্মও বিচিত্র। নির্জন দ্বীপে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ধীবর কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে তাঁর জন্ম। দ্বীপে জন্ম এই জন্য তিনি 'দ্বৈপায়ন'। গাত্র বর্ণ কালো এই জন্য 'কৃষ্ণ', আর তাঁর অমরকীর্তি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করে বেদমন্ত্র সংকলন এবং যথার্থ বিভাজন। এই জন্য তিনি বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

অতি শৈশবে মাতৃআজ্ঞা নিয়ে তিনি গঙ্গাতীরে কর্ণভদ্রতীর্থে পিতা মহর্ষি পরাশরের তপোবনে চলে আসেন। বিদায়কালে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, সেখানেই থাকুন, মায়ের আহ্বানে তিনি মাতৃসকাশে আগমন করবেন। এবং নির্বিচারে মায়ের আজ্ঞা পালন করবেন। পিতা মহর্ষি পরাশরের অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য মেধাবী দ্বৈপায়ন, অল্প বয়সেই বেদবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। অনেক কঠিন বিষয়ও সহজে সমাধান করতে পারেন। পিতা পরাশর তাঁর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট, তাঁর ইচ্ছা এবার দ্বৈপায়ন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে দার পরিগ্রহ করুক। কিন্তু দ্বৈপায়ন সমগ্র বেদশাস্ত্র অধিগত হওয়ার আগে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে সম্মত নন। কিন্তু সমগ্র বেদবিদ্যা অধিগত করা সাধারণের সাধ্যাতীত পিতা পরাশর জানালেন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ জম্বুদ্বীপের গহন অরণ্যে, দুর্গম প্রান্তরে বেদচর্চায় রত আছেন। সম্ভবত জাম্বুদ্বীপে এমন কোনো ঋষি নেই যিনি সমগ্রবেদ অবগত হয়েছেন। ইতিপূর্বে কিছু ঋষি কিছু কিছু বেদমন্ত্র সংগ্রহ এবং বিন্যাস করে 'বেদব্যস' উপাধি লাভ করেছিলেন। জম্বুদ্বীপে কোনো ঋষি সমগ্র বেদ অবগত নন জেনে দ্বৈপায়নের খুব আক্ষেপ হলো। তিনি চিন্তা করলেন, সমগ্র বেদ তাঁকে অধিগত করতেই হবে। কিন্তু পিতা পরাশরের মন সায় দিল না কিশোর পুত্রকে বেদমন্ত্র সংগ্রহের জন্য বিপদসংকুল পথে ঠেলে দিতে। কিন্তু দ্বৈপায়ন অনড়। অবশেষে পিতা তাঁকে আপন অভীষ্ট সাধনের জন্য নৈমিষ্যারণ্যে গমনের সম্মতি দিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদমন্ত্রের স্রষ্টা নন দ্রষ্টা। তিনি বেদচতুষ্টয়ের রচয়িতা নন, সংকলক। সর্বকল্পে বর্তমান বেদমন্ত্র সমূহ তাঁর পূর্বকালেও বিদ্যমান ছিল। বেদসংকলনের জন্য তিনি বেদব্যাস নামে বিশ্বের চিরপূজ্য। তিনি নারায়ণের অবতার স্বরূপ। ভূমিগুণ ও কালগুণ লাভ করে বৃক্ষ যেমন বহু শাখায় বিস্তৃত হয়, তেমন ভাবেই বেদবৃক্ষ তাঁকে লাভ করে বহুশাখায় বিভূষিত হয়েছিল। মহর্ষি বেদব্যাস বেদোদ্ধার করে বেদকে ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব— চারভাগে ভাগ করেও নিশ্চিত হতে পারলেন না। ব্রহ্মবিদ্যার প্রসারের জন্য তিনি উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করে বেদবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই অনুশীলনের ফলে বেদ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে এবং কর্মকাণ্ড সংহিতা ও ব্রাহ্মণে, জ্ঞান কাণ্ড আরণ্যক, উপনিষদে বিভক্ত হলো। সেই গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষে মানুষের জীবন সাধনা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমে বিভিক্ত ছিল।

মহর্ষি বেদব্যাস তেমনই অধিকারী ভেদে সাধনার বিবর্তনের জন্য চার আশ্রমের উপযোগী করে বেদ বিভক্ত করলেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের জন্য বেদের মন্ত্র অংশ সংহিতা ভাগ স্বাধ্যায় কণ্ঠস্থ করার জন্য নির্দিষ্ট করলেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে বেদের ব্রাহ্মণ বিধানে সস্ত্রীক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট হলো। ভোগাবসানে বাণপ্রস্থ আশ্রমে আরণ্যকের নির্দেশে ব্রহ্মচিন্তায় সম্মোহিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রব্রজ্যায় বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন হয়ে উপনিষদ বেদান্তের অনুশীলনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সমীচীন সুব্যবস্থা করে মুক্তির পথ নির্দেশ করলেন। বেদের শেষ বা অন্ত বেদান্ত উপনিষদের সার সংকলন করে মহর্ষি বেদব্যাস মুমুক্ষুমানব সম্প্রদায়ের পরম ও চরম মঙ্গল বিধান আর অমৃতত্ত্ব প্রদানের জন্য ব্রহ্মনিরূপণের যে সূত্র সমষ্টি প্রণয়ন করলেন, তা ব্রহ্মসূত্র। এই সমস্ত কার্যের সঙ্গে মহর্ষি ভাবছেন অজ্ঞলোকের মধ্যে কীভাবে ধর্মভাব জাগ্রত করা যেতে পারে। সেই সময়ে সমাজ বিকৃতি ও পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ হয়েছিল। সদুপদেশ তাদের কাছে রুচিকর ও হৃদয়গ্রাহী হবে না। তবে গল্প শুনতে আপামর সকলেরই অভিরুচি থাকে। যদি সাধারণের চিত্তাকর্ষক কতকগুলি গল্প রচনা করে তাতে কৌশলে ধর্ম কথা নিবিষ্ট করা যায় এবং স্পষ্টভাবে উপদেশ না দিয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা সৎকার্যের সুফল ও অসৎ কার্যের কুফল জ্বলন্তরূপে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাতে মানব সমাজের হিত সাধিত হতে পারে। এরূপ চিন্তা করে মহর্ষি ক্রমে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করলেন। গল্পগুলি প্রায়শ পুরাতন ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হয়েছে বলে মহর্ষি এইগুলিকে 'পুরাণ' নামে আখ্যায়িত করলেন।

সেই দ্বাপর যুগেও যে সর্ববর্ণ সমন্বয়ে এবং বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করার প্রথম প্রচেষ্টা মহর্ষি ব্যাসদেবের মধ্যে দেখতে

ফ ঃ ৬

পাই। ব্যাসদেব যখন নৈমিষারণ্যে পুরাণপাঠ আরম্ভ করেন, তখন সুত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি দূরত্ব বজায় রেখে একপাশে বসে নিবিষ্ট মনে পাঠ এবং ব্যাখ্যা শ্রবণ করতেন। সেই সময়ে সুতজাতি প্রতিলোম বলে সমাজে নিন্দিত ছিল। এই ব্যক্তি অন্য কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। দীর্ঘকাল পাঠ শ্রবণের পর তাঁর ইচ্ছা হলো মহর্ষিকে তিনি পুরাণ পাঠ করে শোনাবেন। একদা নিভৃতে মহর্ষির কাছে সুত এই প্রস্তাব দিলেন। রাজি হলেন মহর্ষি। সুত পুরাণ পাঠ করলেন। সুতের সুললিত কণ্ঠ এবং সরস ব্যাখ্যায় পরম তৃপ্ত হলেন মহর্ষি। সুতকে মহর্ষি তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মতো পুরাণপাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য অনুমতি দিলেন। অন্যান্য শিষ্যেরা এতে আপত্তি করলে মহর্ষি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন ধর্ম কতা যেকোনো ব্যক্তির মুখ থেকে শোনা যেতে পারে। আর যে ব্যক্তি ধর্মকথা শোনাবে সে ব্যাসাসনেও বসতে পারে। বৃক্ষমূলে বসে সুত পুরাণ পাঠ আরম্ভ করলেন। ক্রমে দেখা গেল, ব্যাসের অন্যান্য শিষ্যদের থেকে সুর পাঠ এবং ব্যাখ্যা শোনার জন্য জনসমাগম বেশি হচ্ছে। পরবর্তীকালে ব্যাসদেবের রচনা বলে যে অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত হয়েছে, তার মধ্যে অনেক পুরাণের বক্তা হিসেবেও সুতকে পাওয়া যায়। যেমন কোনো কোনো পুরাণে উল্লেখ আছে 'বৈশম্পায়ন উবাচ', তেমনি কোনো কোনো পুরাণে উল্লেখ আছে 'সুতউবাচ'।

আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের প্রতিটি জনপদে বেদব্যাস শ্রদ্ধেয় এবং অতি পরিচিত নাম। ব্যাসরচিত অষ্টাদশ পুরাণের কাহিনি তখন লোকের মুখে মুখে। সত্যের জয় এবং পাপের বিনাশ, এই আদর্শ ব্যাসদেব মানুষের অন্তরে স্থাপন করতে পেরেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সারা ভারতের মানুষ তার প্রমাণও পেয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে ব্যাসদেবের মূল মহাভারত তখন রচিত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে মহাভারতে প্রচুর অংশ প্রক্ষিপ্ত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়েছে। তেমনই ব্যাসের নামে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণেও যুগে যুগে বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাসের নামে প্রচলিত সহস্র সহস্র স্তবস্তুতি সবগুলি মূলত ব্যাস রচিত কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ কিছু কিছু রচনার মান ব্যাসের মূল রচনার সমমানের নয়। তবে ব্যাস সর্বকালের এমন একটি জনপ্রিয় নাম, তাঁর নামে প্রচলিত যেকোনো রচনাই জনপ্রিয় হয়েছে।

ত্রিশত বর্ষেও জরা মহর্ষিকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর অভিলাষ আর একবার ভারত পরিক্রমা করা। কতিপয় শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। জনপদের পরিবর্তন হয়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, ধর্মবিমুখ মানুষ ধর্মমুখী হয়েছে দেখে ব্যাস তৃপ্ত হলেন। স্থানে স্থানে নতুন দেবালয় গড়ে উঠেছে। বহু নগর, বহু তীর্থ পরিক্রমা করে সশিষ্য ব্যাসদেব উপস্থিত হলেন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন তীর্থ কাশীধামে। এই তীর্থে ব্যাসদেব আগেও এসেছেন, তবে এবার দেখলেন কাশীর প্রভুত উন্নতি হয়েছে। ব্যাসের আগমন সংবাদে নগরবাসী উল্লসিত। বিশ্বনাথের মন্দিরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে ব্যাসদেব তাৎক্ষণিক ভাবে এক শিবস্তুতি রচনা করে সর্বসমক্ষে পাঠ করলেন। কাশীধামের প্রবীণ ও নবীণ পণ্ডিত পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলে মহর্ষি অনুধাবন করলেন, কাশীধাম সম্পূর্ণরূপে শৈব সম্প্রদায়ের করতলগত। অন্য চার সম্প্রদায় বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্যরা এখানে ব্রাত্য। শৈবরা অন্য চার সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন। স্বয়ং ব্রহ্মবাদী হয়েও মহর্ষি বিষ্ণু, শিব, দেবী, সূর্য ও গণপতির নামে পঞ্চ পুরাণ রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত উদারপন্থী। কাশীধামের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মহর্ষির হৃদয়কে ব্যথিত করে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই সাম্প্রদায়িকতা একদিন ভারতবর্ষের আর্যধর্মকে বিপন্ন করবে।

গঙ্গার অপর তীরে জনহীন প্রান্তরে যদি উদার মতাবলম্বী আর একটি তীর্থ স্থাপিত হয়, তবে ধর্মের যে সাম্প্রদায়িক ত্রুটি তা বহুলাংশে প্রশমিত হতে পারে। তীর্থযাত্রীরা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সঙ্গে উদারপন্থী ধর্মমতের সহাবস্থান দেখতে পাবেন। মহর্ষির মনোভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদারপন্থী ধনাঢ্য ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠী, সাধারণ মানুষ সকলেই নতুন নগর নির্মাণের জন্য নিজ নিজ ক্ষমতায় সচেষ্ট হলেন। অল্পদিনের মধ্যে গড়ে উঠল ভবন, মার্গ, পুষ্করিণী, বিপণী। গড়ে উঠল দেবালয়, স্থাপিত হলো নতুন বসতি। কাশীর সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ প্রমাদ গুনলেন। ব্যাসের কাশী প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বনাথের কাশীর গুরুত্ব কমে যাবে। কাজেই ব্যাসকাশী যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় তার জন্য সচেষ্ট হলেন তাঁরা। প্রচার করতে শুরু করলেন শিবের কাশীতে মৃত্যু হলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়, আর ব্যাসকাশীতে মৃত্যু হলে নির্ঘাত গর্দভ হবে। এরকম কুবাক্য ইতর জনের মুখে মুখে ঘুরছে। মহর্ষি মানুষের এহেন নীচতায় ব্যথিত হলেন। যে মানুষের মানসিক উন্নতির জন্য মহর্ষি জীবনপাত করেছেন, সেই মানুষের নীচতায় বিচলিত হলেন দূরদর্শী মহর্ষি। আর্যধর্মের ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন তিনি। চিন্তিত হলেন এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। একদিন ভারতের সার্বিক ঐক্য বিনষ্ট করে দেশকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবে। ভগ্নমনোরথ হয়ে কাশী থেকে বদরিকা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন মহর্ষি। কথিত, প্রায় চারশত বছর বেঁচে ছিলেন ব্যাসদেব। আবার কারও মতে তিনি অমর। মহর্ষি ব্যাসদেবের পুরাণ প্রচার আপামর ভারতবাসীর মনে ধর্মাধর্মের বিচারবোধ জাগ্রত করেছে, অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করেছে, সর্বোপরি নির্মল আনন্দ দিয়েছে। এরই পরম্পরা হিসেবে পরবর্তীকালে সমাজে যাত্রা, কীর্তন, কথকতা এসব শিক্ষা তথা বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়েছে। সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের জীবিকার পথও সুগম হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিশেষত বিগত এবং বর্তমান শতাব্দীতে পুরাণাশ্রিত অসংখ্য যাত্রা, নাটক ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতবাসীর জন্য তিনি যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন, যুগধর্মের নিরিখে তা অতুলনীয়। ভারতবাসী তাঁকে গুরুর সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাই তাঁর পুণ্য জন্মতিথি আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিকে 'গুরুপূর্ণিমা' রূপে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

ত্বাং বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিতশুভদ্ধবুদ্ধিং
চর্মাবরং কৃষ্ণতাত্বিষং মুনিভিঃ পূতিতং।।
কনক-পিঙ্গলজটা-কলাপং কবীন্দ্রং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকংঋষিণাং।। □

নির্বাসন থেকে ঘরে ফেরা

তসলিমা নাসরিনকে ঘিরে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি

বাংলাভাষা তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যজীবনের প্রাণ। সেই ভাষার রাজধানী কলকাতা থেকে তাঁর দীর্ঘ বিচ্ছেদ ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। আজ যদি সেই দূরত্ব ঘুচে যায়, তবে তা শুধু একজন লেখকের ব্যক্তিগত প্রত্যাবর্তন হবে না; বাংলাভাষা, সাহিত্য এবং মুক্তচিন্তার পক্ষেও তা একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

কিছু মানুষকে আমরা শুধু তাঁদের লেখার জন্য মনে রাখি না, তাঁদের সাহস, ব্যক্তিত্ব, বন্ধুত্ব এবং সময়ের সাক্ষী হয়ে ওঠা জীবনযাপনের জন্যও মনে রাখি। তসলিমা নাসরিন আমার কাছে তেমনই এক মানুষ। তাঁকে নিয়ে জনসমক্ষে বহু আলোচনা, বিতর্ক, রাজনৈতিক মতভেদ হয়েছে; কিন্তু আমার স্মৃতিতে তিনি প্রথমত একজন লেখক, একজন বন্ধু, একজন অসাধারণ অতিথিপরায়ণ মানুষ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য মূল্য চোকানো এক সাহসী ব্যক্তিত্ব।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাসনের পর দীর্ঘ প্রায় দুই দশক কেটে গেছে। এতদিন পর তিনি আবার কলকাতায় ফিরছেন— এই সংবাদ নিঃসন্দেহে আমার কাছে গভীর আনন্দের। কারণ এই ফিরে আসা শুধু একজন লেখকের কলকাতায় ফেরা নয়; এটি বঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এক বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের পুনর্মিলনের প্রতীক।

তসলিমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের বাড়িতে। একদিন শিবদার ফোন এল— ‘তসলিমা আসছে, তুমি এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।’ সেই প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর ধীরে ধীরে পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

সেই সময় আমরা--- অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, অধ্যাপক অম্লান দত্ত ও

একজন লেখকের সঙ্গে মতের অমিল থাকতেই পারে; কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সমাজে তাঁর লেখার উত্তর লেখা দিয়ে দিতে হয়, নির্বাসন দিয়ে নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেবল একজন ব্যক্তির অধিকার নয়, তা একটি সভ্য সমাজের পরিচয়।

আমি--- প্রায়ই তসলিমার কলকাতার বাড়িতে যেতাম। কখনো ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের বাড়ি, কখনো রডন স্ট্রিটের বাসভবন। সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, সিনেমা— সব মিলিয়ে দীর্ঘ আড্ডা চলত। আড্ডার আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল তসলিমার নিজের হাতে রান্না করা খাবার। তিনি যেমন লেখালেখি ভালোবাসতেন, তেমনি রান্নাও করতেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। অতিথিদের নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে তাঁর ছিল এক অন্যরকম আনন্দ।

আমরা একসঙ্গে অসংখ্য ভালো চলচ্চিত্র দেখেছি। বিশ্ব সিনেমা নিয়ে আলোচনা চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তখন আজকের মতো ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের যুগ আসেনি। ভালো সিনেমা দেখতে হলে টিকিট সংগ্রহ করতে হতো, বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে দেখতে হতো। সিনেমা ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তারপর এল এক অস্থির সময়। কলকাতার পার্ক সার্কাসে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হলো। একদল জেহাদি জনতা রাস্তা অবরোধ করে তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করল। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল। সেই সময় শিবনারায়ণ রায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে ফোন করেন। আমরা--- শিবদা, অম্লানদা ও আমি---

সরাসরি তসলিমার বাড়িতে পৌঁছে যাই। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলি। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। সেদিন বিদায় নেওয়ার সময়ও ভাবিনি, সেটাই হয়তো কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা।

পরদিন দুপুরে হঠাৎ তসলিমার ফোন। ওর কণ্ঠে ছিল গভীর বেদনা। বলল, 'অরুণ, শিবদা আর অম্লানদাকে বলবেন, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ আমাকে কলকাতার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না। যাওয়ার আগে আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো না।'

ফোনটি আজও আমার কানে বাজে। পরে জানতে পারি, তাঁকে কলকাতা থেকে সরিয়ে জয়পুরের একটি নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একজন লেখক, যিনি কলম ছাড়া আর কোনো অস্ত্র ব্যবহার করেননি, তাঁকে নিজের ভাষার শহর ছেড়ে এভাবে চলে যেতে হবে— এ এক গভীর বেদনার অধ্যায়।

এরপর দীর্ঘ সময় কেটে যায়। তসলিমা কখনো ইউরোপে, কখনো আমেরিকায়, কখনো দিল্লিতে। কিন্তু কলকাতা থেকে তাঁর দূরত্ব আর ঘুচল না।

এক সময় তিনি আমেরিকায় একটি ফেলোশিপ নিয়ে যান। বিদেশে যাওয়ার আগে আমার কাছে রেখে যান দুটি সুটকেস ভর্তি ডিভিডি। বিশ্বাস থেকেই এই অমূল্য দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

পরে কলকাতায় ফিরে সেই সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই আমরা 'ভালো ছবি' নামে একটি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করি গোর্কি সদনে। এই উদ্যোগ সম্ভব হয় গৌতমদার আন্তরিক সহযোগিতায়, যিনি তখন গোর্কি সদনের প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ ছিলেন। সাত দিন ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকদের ছবি প্রদর্শিত হয়। তখনও নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম কিংবা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেনি। তাই চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে এই উৎসব ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

কলকাতা বইমেলা তসলিমার অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। অথচ বছরের পর বছর তিনি সেই বইমেলায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে, পাঠকের হাতে পৌঁছেছে, কিন্তু লেখক নিজে উপস্থিত থাকার অধিকার পাননি।

একবার তাঁর একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে আমি নিয়ে যাই কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক অম্লান দত্তকে। তাঁরা বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের মাঝখানে আমি ফোনে তসলিমাকে বক্তাদের বক্তব্য শোনাই। একদিকে নিজের বই প্রকাশের আনন্দ, অন্যদিকে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারার বেদনা— দুই অনুভূতি যেন একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

পরবর্তী কালে রেডিয়েন্স পাবলিকেশনের উদ্যোগে বইমেলায় তসলিমার একটি কবিতা সমগ্র প্রকাশের সুযোগ হয়। প্রচ্ছদ ও মুখবন্ধ লেখার দায়িত্বও তিনি আমাকে দেন। হার্ভার্ডে ফেলোশিপ নিয়ে আমেরিকাতে থাকার সময় আমাকে পাঠানো তাঁর কবিতাগুলির সঙ্গে আরও কিছু নতুন কবিতা মিলিয়ে সেই সংকলন প্রকাশিত হয়। একজন লেখকের এই আস্থা আমার কাছে আজও অত্যন্ত মূল্যবান স্মৃতি।

দেখতে দেখতে সময় বয়ে যায়। প্রায় ষোলো বছর পর দিল্লিতে আবার আমাদের দেখা হয়। আমি হোটেল বুক করেছিলাম। কিন্তু তসলিমা অনুরোধ করলেন, হোটেলে নয়, তাঁর বাড়িতেই থাকতে হবে। আবার সেই পুরনো আড্ডা, আবার তাঁর নিজের হাতে রান্না করা খাবার, আবার সাহিত্য, রাজনীতি, সিনেমা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা।

সেই সময় তিনি আমাকে এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা জানান। কীভাবে দিল্লির এক প্রসিদ্ধ হাসপাতালে এবং এক নামি চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাঁর হিপ রিপ্লেসমেন্ট অপারেশন করা হয়েছিল। বিপুল অর্থ ব্যয় করার পাশাপাশি ভুল চিকিৎসার কারণে তিনি প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। চিকিৎসা-ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ে তাঁর গভীর ক্ষোভ ছিল। মানুষের জীবন নিয়ে যে কখনো কখনো নির্মম ব্যবসা হয়, সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল।

আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। একদিন কবি শতরূপা সান্যাল ফোন করে জানালেন, বিজেপির সংসদ সদস্য শমীক ভট্টাচার্য সংসদে তসলিমা নাসরিনের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার বিষয়টি উত্থাপন করতে চান। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তসলিমা নিজে কী ভাবছেন। আমি তসলিমার সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি স্পষ্ট করে জানান, পশ্চিমবঙ্গে ফেরার ইচ্ছা তাঁর কখনো মুছে যায়নি। সেই বার্তাই শমীকবাবুর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

আজ যখন শুনছি দীর্ঘ নির্বাসনের পর তিনি আবার কলকাতায় ফিরছেন, তখন মনে হচ্ছে ইতিহাস যেন একটি অসমাপ্ত অধ্যায় শেষ করতে চলেছে। একজন লেখকের সঙ্গে মতের অমিল থাকতেই পারে; কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সমাজে তাঁর লেখার উত্তর লেখা দিয়ে দিতে হয়, নির্বাসন দিয়ে নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেবল একজন ব্যক্তির অধিকার নয়, তা একটি সভ্য সমাজের পরিচয়।

বাংলাভাষা তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যজীবনের প্রাণ। সেই ভাষার রাজধানী কলকাতা থেকে তাঁর দীর্ঘ বিচ্ছেদ ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। আজ যদি সেই দূরত্ব ঘুচে যায়, তবে তা শুধু একজন লেখকের ব্যক্তিগত প্রত্যাবর্তন হবে না; বাংলাভাষা, সাহিত্য এবং মুক্তচিন্তার পক্ষেও তা একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এই ফিরে আসা বহু বছরের স্মৃতি, অসংখ্য আড্ডা, বই, চলচ্চিত্র, বন্ধুত্ব এবং বিচ্ছেদের ইতিহাসকে নতুন করে স্পর্শ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। সময় অনেক কিছু বদলে দেয়, কিন্তু কিছু সম্পর্ক, কিছু স্মৃতি এবং কিছু মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা সময়ের সীমানা অতিক্রম করে থেকে যায়। তসলিমা নাসরিনের কলকাতায় প্রত্যাবর্তন সেই দীর্ঘ স্মৃতির পথ ধরে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করুক— এই কামনাই রইল। □

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'পঞ্চ পরিবর্তন' ভাবনা পরম বৈভবশালী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

সঙ্ঘের শতবর্ষ যোজনার অন্তর্গত 'পঞ্চ পরিবর্তন' ভাবনা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও সকল স্তরের কার্যকর্তাদের মধ্যে সুপরিচিত ও সুবিদিত। সাংগঠনিক স্তর থেকে সার্বজনিক সভা এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনাচক্রে পরমপূজ্য সরসঙ্ঘচালক থেকে সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যকর্তারা ক্রমাগত এই ভাবনার কথা জনমানসে তুলে ধরছেন। কিন্তু ফলিত স্তরে প্রান্তিক স্তরে যতক্ষণ না এই ভাবনার গুরুত্ব অনুভূত হচ্ছে, ততক্ষণ এর পূর্ণ সাফল্য অধরা থাকবে। তাই সমাজের বিদ্বজ্জন, যাঁদের স্থানীয় এলাকায় সম্মান ও প্রভাব আছে, তাঁদের এই 'পঞ্চ পরিবর্তন' ভাবনাটি অনুধাবন করে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে যাতে তারা এই ভাবনার সঙ্গে একাত্মবোধ করে নিজেদের পরিবারে এর বাস্তবায়ন ঘটান।

'পঞ্চ পরিবর্তন' হলো ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সেই পাঁচটি পরিবর্তন যা একজন আদর্শ ব্যক্তি, আদর্শ সমাজ ও পরম বৈভবশালী দেশ গঠনের অন্যতম পূর্ব শর্ত। সঙ্ঘ উল্লেখিত এই পঞ্চ পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলি হলো--- পরিবার প্রবোধন, পর্যাবরণ, সামাজিক সমরসতা, নাগরিক কর্তব্য ও স্ব-ভাবের জাগরণ। একটি আত্মবিস্মৃত, অসুস্থ ও বহুখণ্ডিত সমাজ কখনোই একটি শক্তিশালী ও উন্নত দেশ গড়তে পারে না। তাই আত্মশুদ্ধি, সুসংহত সমাজ ও দেশ গঠন একটি সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হতে হয়। তাই 'পঞ্চ পরিবর্তন'-এর এই তত্ত্বকে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

পরিবার প্রবোধনের ফলপ্রসূ প্রয়োগ একটি পরিবারকে আদর্শ, সুস্থ ও মূল্যবোধসম্পন্ন ভারতীয় পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট সময় পরিবারের সবাই একসঙ্গে কাটানো, একসঙ্গে বসে খাদ্য গ্রহণ করা, স্বাস্থ্যকর ও ভারতীয় খাদ্যের যতদূর সম্ভব ভোজন, ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনি শিশুদের গল্পের ছলে বলা ও হৃদয়ঙ্গম করানোর মধ্য দিয়ে পরিবারকে সুসংস্কৃত পরিবার হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। পরিবারে একে অন্যের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানো ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবারের ঐক্য অটুট থাকে ও পরিবার শক্তিশালী হয়। আর পরিবার শক্তিশালী হলে পারিবারিক শত্রুর আক্রমণও ভোঁতা হয়ে যায়। স্থানীয় স্তরে প্রত্যেকটি পরিবার যদি এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তাহলে শক্তিশালী পরিবার শক্তিশালী, সুসংগঠিত, আপন ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সচেতন সমাজ তৈরি করবে যা বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস বিগত ১০০ বছর ধরেই সঙ্ঘ করে যাচ্ছে, যা সঙ্ঘের প্রার্থনার শেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে উল্লেখিত রয়েছে—

> 'পরং বৈভবং নেতুমেতৎ স্বরাষ্ট্রং
> সমর্থা ভবত্বাশিষা তে ভৃশম্।।'

বিগত ১০০ বছর ধরে সঙ্ঘের নিরলস প্রয়াস অনেকাংশে সফলও হয়েছে। ভারত যে বিশ্বগুরুর আসনে আসীন হতে চলেছে তা বিশ্ব ভূ-রাজনীতিতে ভারতের প্রবল প্রভাব থেকেই বোঝা যায়। ভারতের বহু দশক ধরে লালিত জোট-নিরপেক্ষ কূটনীতি বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই ভারতকে সম্মানের আসনে আসীন করেছে। আর ভারতীয় সমাজ যে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তা বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রভক্ত দলের প্রতি জনসমর্থন ও জেহাদি শক্তিকে পরাস্ত করার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। সমাজের যে অংশ এখনো মূলধারার ভারতীয় দর্শন ও ভাবধারা থেকে বিচ্যুত রয়েছে, তাদেরকেও এই পরিবার প্রবোধনের সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিন্দুত্বের বৃহত্তর আঙিনায় নিয়ে আসতে হবে, তবেই সনাতনী লক্ষ্য 'ন হিন্দুপতিত ভবেৎ' ফলপ্রসূ হবে।

পঞ্চ পরিবর্তনের দ্বিতীয় পরিবর্তন, 'পর্যাবরণ'— পরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতা প্রসারে বিশেষভাবে উপযোগী। এই পরিবর্তন প্রয়াসের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিহত করা, মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতাকে জন-আন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে সঙ্ঘ। দিন দিন যেভাবে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার সংকুচিত হচ্ছে, মানুষ যদি জলের অপচয় রোধে প্রয়াস না করে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে জলের

মেকলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ছাত্রদের আত্মবিস্মৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা— যাদের উদ্দেশ্য হবে শুধু ব্রিটিশের দাসত্ব করা।

জন্য গৃহযুদ্ধ আসন্ন। পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা-সহ পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে সমাজের একেবারে প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া জরুরি।

হিন্দু সমাজে অনৈক্যের একটি মূল কারণ হলো জাতিগত বৈষম্য। দীর্ঘ এক হাজার বছরের ইসলামি ও ব্রিটিশ শাসনকালে পরাধীন দেশে সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে যে গ্লানির সৃষ্টির হয়, তাকে সচতুর ইংরেজ 'জাতিভেদ প্রথা' হিসেবে আখ্যা দেয়। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজে সুপ্রাচীনকাল থেকে গড়ে ওঠা 'বর্ণাশ্রম' ব্যবস্থা কোনো দিনই 'জাতিভেদ' বা জাতিবিদ্বেষ আধারিত কোনো সামাজিক শ্রেণীবিভাজন নয়। ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে 'কাস্ট-সিস্টেম' হিসেবে দাগিয়ে দেয় ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শাসক। ভারতবর্ষকে শাসনের জন্য 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্রিটিশ। হিন্দুজাতি ও সমাজকে চিরন্তনভাবে বিভক্ত রাখার জন্য পাশ্চাত্যের 'কাস্ট' কনসেপ্টকে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করে দেন ব্রিটিশ-পোষিত তথাকথিত ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদরা। বিদেশিদের তৈরি এই তত্ত্ব দেশজুড়ে প্রচার করে বিদেশিদের তল্পিবাহক একশ্রেণীর ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত ইতিহাসবিদ। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাব্যবস্থা, জনগণনা-সহ আরও বিবিধ প্রক্রিয়ায় অপপ্রচার ও নানা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই বিষাক্ত ভারত-বিরোধী, ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতীয় সমাজের ওপর কার্যত চাপিয়ে দেয় তাদের তৈরি এই মতবাদ। ভারতীয় সমাজে উপ্ত অবক্ষয়ের বীজ ঔপনিবেশিক শক্তির চক্রান্তে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের কিছু অংশে মহীরুহে পরিণত হয়।

বিদেশি শক্তি ও তাদের অনুসারীদের বর্ণিত 'জাতিভেদ প্রথা' দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও দেশের কিছু কিছু অংশে বর্তমান, যদিও তার প্রাবল্য আগের থেকে অনেক কমেছে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি জানত যে, ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদেশে তাদের শাসনের ভিত মজবুত করতে হলে হিন্দুসমাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হবে। ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক আইনানুযায়ী হিন্দুসমাজের বৃহদংশকে 'নিম্নবর্গীয় জনসমাজ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভারতীয় সমাজকে ভাঙতে খ্রিস্টান মিশনারিদের আসরে নামায় ঔপনিবেশিক শক্তি। 'নিম্নবর্গীয় জনসমাজ' হিন্দুসমাজের অংশ নয়, তারা জাতি ও বর্ণবৈষম্যের শিকার--- এই ধারণা হিন্দুসমাজের চিন্তা-চেতনায় প্রোথিত করে দেয় মেকলীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও খ্রিস্টান মিশনারিরা। এর ফলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের একটা বড়ো অংশ বৃহত্তর হিন্দুসমাজের প্রতি বিরক্ত হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মান্তরণের কবলে পড়ে। সরকারি ব্রিটিশ শক্তির সরাসরি মদতে দেশজুড়ে শুরু হয় ধর্মান্তরণ।

স্বাধীনতার পরও বিভিন্ন আইনের সুযোগ নিয়ে দেশে অব্যাহত রয়েছে ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়া। বহুদিন ধরেই হিন্দু সমাজে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনে একাধিক প্রয়াস গ্রহণ করেছে সঙ্ঘ, তার মধ্যে 'সহভোজ' একটি জনপ্রিয় রীতি। স্বয়ংসেবকদের ঐকান্তিক প্রয়াসে জাতি ও বর্ণবৈষম্য আগের থেকে অনেক কমেছে, তবুও সমাজ থেকে এটি একেবারে নির্মূল করতে পঞ্চ পরিবর্তনের অন্যতম প্রক্রিয়া---'সামাজিক সমরসতা' একটি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

দেশের যেমন নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে, নাগরিকদেরও দেশের প্রতি অনেক দায়িত্ব রয়েছে এবং নাগরিকদের সেই কর্তব্য— নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা উচিত। দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিকই একটি সুস্থ সমাজ ও দেশ গঠন করতে পারে। সরকার প্রণীত আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, সেরকমই সেগুলি শুধু নিজে মান্য করাই নয়, অন্যকে মান্য করার জন্য প্রাণিত করতে হবে।

আজকের দিনে 'নাগরিক কর্তব্য' মান্য না করার একটি বড়ো নিদর্শন হলো রাস্তায় ট্রাফিক আইনের অহরহ উল্লঙ্ঘন। শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) না পরে পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি ও আইন অমান্য করার প্রতিযোগিতা— এটি ভারতের অধিকাংশ শহরের নিত্যদিনের ছবি। কিন্তু নাগরিকদের মনে রাখতে হবে, যন্ত্রচালিত দ্বি-চক্র যান শিরস্ত্রাণ পরে চালানো উচিত নিজেদের শারীরিক সুরক্ষার কথা ভেবেই। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি না থাকার কারণে লাল সিগন্যাল থাকলেও গাড়ি চলাচল করে। তাই মানুষের মধ্যে নাগরিক সচেতনতার বিকাশ ঘটানোর জন্য সঙ্ঘ 'পঞ্চ পরিবর্তন'-এর মধ্যে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

একটি জাতির বিকাশে দেশের নাগরিকদের আত্মপরিচয়ের পরম্পরা জানা ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বুকে কয়েকশো বছরের বিদেশি শাসন ও শোষণ নাগরিকদের মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতার সৃষ্টি করেছিল। এর সঙ্গে যোগ হয় পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতি ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ ব্রাত্য করে প্রণীত হয়েছিল। মেকলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ছাত্রদের আত্মবিস্মৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা— যাদের উদ্দেশ্য হবে শুধু ব্রিটিশের দাসত্ব করা।

১৯২৫ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পরমপূজ্য ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী ও সঙ্ঘের অসংখ্য কার্যকর্তা ভারতীয় যুবকদের মধ্যে আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের ভারতবোধে জাগরিত করার অবিরত প্রয়াস করে চলেছেন। এই প্রয়াসকেও এবার আন্দোলনের রূপ দেওয়ার জন্য 'স্ব-ভাবনার জাগরণ'কে পঞ্চ পরিবর্তনের অন্যতম প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে সঙ্ঘ।

সঙ্ঘ নির্ধারিত এই 'পঞ্চ পরিবর্তন'কে জন-আন্দোলনের রূপ দেওয়ার দায়িত্ব প্রত্যেক স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘ অনুরাগীর। এই লক্ষ্যে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করা অব্যাহত রাখতে হবে। □

একুশে জুলাই আসলে কার?

বিপ্লব বিকাশ

গত ২১ জুলাই এক অভুতপূর্ব আইনি, রাজনৈতিক ও নীতিগত প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনের সভা কিংবা শহরের রাস্তায় যে ভিড়, সেই আবেগের সত্ত আসলে কার? মমতা ব্যানার্জির, নাকি সার্বিক ট্রাস্টি হিসেবে 'তৃণমূল' দলের? আর দল যদি দ্বিধাভক্ত হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে থাকে, তবে আইন ও বাস্তবের বিচারে এর আইনি ও নৈতিক অধিকারই-বা কার?

মূল ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের দাবিতে রাইটার্স ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল যুব কংগ্রেস, যার রাজ্য সভানেত্রী ছিলেন মমতা ব্যানার্জি। সেখানে পুলিশের গুলিতে ১৩ জন রাজনৈতিক কর্মী প্রাণ হারান। অর্থাৎ রাজনৈতিক ইতিহাসের খাতায় এই কর্মসূচির আয়োজক ছিল কংগ্রেসের যুব সংগঠন।

১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি মমতা ব্যানার্জি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন। কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেও তিনি ২১ জুলাইয়ের রাজনৈতিক ও আবেগঘন 'শহিদ দিবস'-এর পুরো আবেগটি নিজের নতুন দলে স্থানান্তরিত করেন। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে ২১ জুলাই হয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান বার্ষিক রাজনৈতিক সমাবেশ ও নীতি-নির্ধারণী মঞ্চ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ২০২৬ সালের আজকের এই নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায়।

সাম্প্রতিক সাংগঠনিক ভাঙনের পর তৃণমূল আজ দুই ভাগে বিভক্ত—একদিকে 'কালীঘাট তৃণমূল' এবং অন্যদিকে 'ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহী তৃণমূল'। এখন আইনি ও রাজনৈতিক বিচারে '২১ জুলাই'-এর দাবিদার কে?

আইনি ও সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতের নির্বাচন কমিশনের 'প্যারাগ্রাফ ১৫' (Symbols Order, 1968) অনুযায়ী কোনো দল বিভক্ত হলে আসল দলের প্রতীক ও নামের দাবি নির্ধারিত হয় প্রধানত দুটি শর্তে—সাংগঠনিক ও সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (Test of Majority)। যদিও ঋতব্রত গোষ্ঠী নিজেদের আসল 'তৃণমূল' দাবি করে আলিপুর আদালত ও নির্বাচন কমিশনের দ্বারে কড়া নেড়েছে, বাস্তবতার দাঁড়িপাল্লা কিন্তু অন্য কথা বলছে।

কিন্তু আদালতের স্থগিতাদেশ বা নির্বাচন কমিশনের নথিপত্রের বাইরে গিয়ে যদি বাস্তব রাজনীতির দৃষ্টিতে মাপা যায়, তবে ২১ জুলাই মূলত প্রতীকের লড়াই পেরিয়ে 'ব্যক্তিসত্তা' ও 'জনপ্রভাবের' লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। বিদ্রোহী অংশ আইনি নথি ও আলিপুর আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশকে অস্ত্র করে দলীয় কাঠামোর ওপর অধিকার দাবি করতেই পারে, কিন্তু মাঠের রাজনীতিতে কর্মী-সমর্থকদের আবেগ ও ভিড় টেনে আনার ক্ষমতা দলীয় প্রতীকের চেয়ে মমতা ব্যানার্জির ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

কিন্তু নিজের দলের কর্মীদের আবেগ যে নাড়িয়ে দিতে পারে সেই নেত্রী সত্যি কি এখনো কর্মীদের মনের আঙিনায় আশার আলো জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম? বিদ্রোহী তৃণমূলের মুখ ঋতব্রত না কাকলি ঘোষ দস্তিদার, না কি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়? ঋতব্রত কি আসল তৃণমূল? সে তো সেই দল থেকেই আগত যার বিরুদ্ধে রাইটার্স অভিযান আর ১৩ জন কর্মীর বলিদান হয়েছিল। কী নির্মম পরিহাস কালের। মনে হচ্ছে ইতিহাস এক অদ্ভুত ও নির্মম আবর্তে এসে আজ আবার থমকে দাঁড়িয়েছে! ১৯৯৩ সালে রাজপথের সেই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনটি ছিল মূলত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মসূচি, কিন্তু নিজের অসামান্য ব্যক্তিসত্তা ও জনমোহিনী নেতৃত্ব দিয়ে মমতা ব্যানার্জি সেই আবেগীয় কর্মসূচি, ও জনমোহিনী নেতৃত্ব দিয়ে একপ্রকার একচ্ছত্রভাবে নিজের ও তাঁর নতুন দলের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন। তিনি সেদিন সংস্থাগত স্বত্বকে ব্যক্তিগত ক্যারিশমায় রূপান্তর করেছিলেন। কিন্তু নিয়তির খেলা হয়তো একেই বলে—আজ তিন দশক পর ইতিহাস যেন ঠিক একই মোড়ে এসে আবার দাঁড়িয়েছে। গতকাল যা ছিল কংগ্রেসের থেকে 'অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া', আজ সেটাই ফিরে আসছে নিজের ঘরে। সংসদীয় ক্ষমতার ভারসাম্য ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে মমতা ব্যানার্জির বলয় থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা রাজনীতিতে কেবল এক নতুন মেরুকরণ নয়, বরং এক পরম সত্যকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—কর্মের ফল মোছা অসম্ভব; ক্ষমতার চক্রে যাকে একদিন হিরো বলা হয়, সময় তাকেই আবার একদিন জিরো করে দেয়। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৯১)

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের অবস্থা তখন সঙ্কটাপন্ন, বিশেষত নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর জঘন্য অত্যাচার, হিন্দু হত্যালীলা ইতিহাসের এক ক্রূরতম অধ্যায় রচনা করেছিল। আর এই সমস্ত কাজ হচ্ছিল তৎকালীন সুরাবর্দির শাসনে এবং তাঁর সরাসরি মদতে। ইংরেজ সরকার সব দেখেও চোখ বুজেছিল, হিন্দুরা যেন মাথা তুলতে না পারে তাই মুসলিম লিগের সহযোগিতা নেওয়ার কূট কৌশল।

ডাক্তারজীর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বোম্বাই থেকে ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পত্র এল যে, তিনি ২০ মে, ১৯৪০, ডাক্তারজীর সঙ্গে নাগপুরে দেখা করতে আসবেন আর ২১ মে কলকাতা ফিরে যাবেন। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের এই সঙ্কটাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা। নাগপুরে তখন অধিকারী শিক্ষা বর্গ চলছিল। ড: শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষণ বর্গ পরিদর্শন করে রাত ন'টায় ডাক্তারজীর বাড়িতে আসেন। ডাক্তারজী দরজার সামনে এগিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। করমর্দনের সময় শ্যামাপ্রসাদ ডাক্তারজীকে জিজ্ঞেস করলেন— 'আমি শুনেছিলাম আপনি অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী হয়ে আছেন'। এ কথা শুনে ডাক্তারজী হেসে বললেন— 'আপনার মতো বড়ো ডাক্তার আমার বাড়িতে আসছেন শুনেই আমার অসুখ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে'। এই সময় ডাক্তারজীর জ্বর ছিল ১০৩ ডিগ্রি। কী অদ্ভুত আত্মশক্তি! কথোপকথনের মধ্যে ড: শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু দুর্দশার বর্ণনা করে বঙ্গে এখন 'হিন্দু সুরক্ষা দল' তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সব শুনে ডাক্তারজী অত্যন্ত গম্ভীর ও শান্তস্বরে বিশদভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন— 'বঙ্গ অথবা পঞ্জাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং নানা স্থানে হিন্দুদের পক্ষে যে বিকট পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে, তার মূল কারণ হলো আমাদের সমাজের অসংগঠিত অবস্থা। এই অবস্থাকে স্থায়ী রূপে দূর করা না গেলে কোনো না কোনো স্থানে হিন্দুদের উপর এমন অত্যাচার চলতেই থাকবে। হিন্দুদের মধ্যে সমষ্টি ভাব নির্মাণ করা এবং পারস্পরিক প্রেম এবং রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বৈভবের শিখরে আরূঢ় হওয়ার মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষা নির্মাণ করাই রাষ্ট্রোত্থানের সূত্র ও স্থায়ী পথ এবং সঙ্ঘ সেই পথই অনুসরণ করে চলেছে'। ড: শ্যামাপ্রসাদ এই সময় সঙ্ঘের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করলে ডাক্তারজী তা সম্ভব নয় বলেই মত ব্যক্ত করেন বরং কলকাতায় সদ্য শুরু সঙ্ঘ কার্যকে সহযোগিতা করে আশীর্বাদ দানের কামনা করেন যাতে সেখানকার হিন্দু সমাজ সংগঠিত হয়ে আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারে। ডাক্তারজীর আত্মবিশ্বাস ও মৌলিক চিন্তাধারায় ড: মুখার্জি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং এক আত্মীয়তাপূর্ণ পরিবেশে সমাপ্ত হলো সেদিনের আলোচনা।

(৯২)

স্বদেশী বস্তু

রাষ্ট্র ভাবনায় ওতপ্রোত ব্যক্তি বিদেশি সামগ্রীকে কখনো গ্রহণ করতে পারে না। আবাল্য দেশাত্মবোধের আলোকে জাগ্রত হৃদয় ডাক্তারজীও কোনো বিদেশি চিহ্ন এবং বিদেশি বস্তু ব্যবহার সহ্য করতে পারতেন না। একবার এক স্বয়ংসেবক পশুর লোমের টুপি পরে এলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকে বললেন— 'আজই এই টুপি পুড়িয়ে ফেল, অন্য কাউকে দিয়ে এই বিদেশি বস্তু ব্যবহারের পাপ তার ওপরে চাপিও না।' বিদেশি প্রভুত্বের চিহ্নগুলি তার কাছে অসহনীয় ছিল। তাই তিনি অনেক জায়গার নামই বদলে দেন। যেমন, 'আলিপুর' হলো 'শিবপুর', 'মঙ্গলুর পীর' হলো 'মঙ্গলুর নাথ', 'মঙ্গলুর দস্তগীর'-এর নাম 'মঙ্গলুর দত্ত' এই নামে পরিচিত করেন। 'দাবল ভক্ত' স্বয়ংসেবকের উপনাম পরিবর্তিত হয়ে 'গৌতম' হয়ে গেল। সঙ্ঘে বিভিন্ন স্বদেশি খেলার প্রচলন করেন তিনি। প্রার্থনা, আজ্ঞা সমস্ত করা হয় সংস্কৃত ভাষায়। এই কাজে অনেক স্বয়ংসেবককে নানা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অনেক বছর ধরে চেষ্টা করতে হয়।

১৯৪০ সালে পুনার অধিকারী শিক্ষণ বর্গে (ওটিসি) সর্বপ্রথম পূর্ণরূপে সঙ্ঘের সংস্কৃত আজ্ঞা ও প্রার্থনার শুরু হয়। এর পূর্বে হিন্দি-মারাঠি মিশ্রিত ভাষায় প্রার্থনা আজ্ঞা প্রচলিত ছিল। স্বদেশি শব্দ সমূহের ব্যবহারেও ডাক্তারজীর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। স্বদেশি বিষয়টি ডাক্তারজীর শরীরে রক্তপ্রবাহের মধ্যে ধ্বনিত হতো। এই কারণে যতদিন পর্যন্ত স্বদেশি পালিশ অমিল ছিল তিনি তাঁর বেল্টের পিতলের অংশ ইটের গুঁড়ো দিয়ে পরিষ্কার করতেন। তাতেই সুন্দর চকচক করতো পিতলের অংশটি। টুপিতে আগে চামড়া লাগানো হতো। তিনি তার পরিবর্তন করেন, তিনি বিনা চামড়ার স্বদেশি পশমের টুপি প্রচলন করেন। স্বদেশ, স্বজাতি (হিন্দু) 'স্ব'-এর অনুভূতির যে এক সক্রিয় রূপ তাঁর চিন্তনকার্য ও পদ্ধতির মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, তার দ্বারা যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসতেন তারা সকলে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হতেন, স্বদেশি বোধে উদ্বুদ্ধ হতেন।

সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস